وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ দারদা ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা কেবল নিজ চেষ্টার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি কল্যাণ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তাকে তা প্রদাণ করবেন এবং যে অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে তাকে তা হতে মুক্ত রাখবেন’(ত্ববারানী, সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৪২)।

● ৭ম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٧، جمادى الثاني و رجب ١٤٤٤ هـ/ يناير ٢٠٢٣م العدد: ٣، الجزء: ٧٥
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রিন্সেস মাইজুন বিনতে আহমাদ মসজিদ, মাসকাট, ওমান : অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদটি ২০০৬ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে একটি বিশালাকার গম্বুজ ও দুটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। মসজিদের বাইরের অংশ রংবিহীন শ্বেত পাথরে মোড়ানো এবং ভিতরের অংশ বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সজ্জিত। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ছালাতের ব্যবস্থাসম্পন্ন মসজিদ কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি লাইব্রেরি, বাগান, পার্কিং স্পেসসহ আধুনিক সকল সুবিধা।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২৩ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জানুয়ারি	০৮ জুমা: আখের	সোমবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৫ ,,	১২ ,,	বৃহস্পতিবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
১০ ,,	১৭ ,,	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৯	০৬:৪৯
১৫ ,,	২২ ,,	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩৩	০৬.৫২
২০ ,,	২৭ ,,	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৫	০৫:৩৭	০৬:৫৫
২৫ ,,	০২ রজব	বুধবার	০৫:২৩	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৪০	০৬:৫৮

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-২	-২	-২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	০	০	-৩
টাঙ্গাইল	+৩	+৩	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	+০
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৪
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	-১	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+২	+২	-২
শেরপুর	+৪	+৪	০
জামালপুর	+৪	+৪	০
নেত্রকোনা	+১	+১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-২
কক্সবাজার	-	-	-
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৪
রাঙ্গামাটি	-৮	-১০	-৪
বান্দরবান	-৯	-১০	-৪
কুমিল্লা	-৩	-৩	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	+৪	+৪	+২
চাঁদপুর	-১	-২	০
ফেনী	-৫	-৫	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৪	-৩	-৮
সুনামগঞ্জ	-২	-১	-৬
মৌলভীবাজার	-৪	-৪	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-২	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৯	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+১০	+৭
নাটোর	+৭	+৭	+৫
পাবনা	+৫	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৫	+২
বগুড়া	+৬	+৬	+২
নওগাঁ	+৮	+৮	+৪
জয়পুরহাট	+৮	+৮	+৩

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৮	+৮	+১
দিনাজপুর	+১০	+১১	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৭	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৭	-১
লালমনিরহাট	+৭	+৮	০
নীলফামারী	+১০	+১০	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১২	+৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৩	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৭
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৭
কুষ্টিয়া	+৬	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৪	+৪	+৫
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+৩
পিরোজপুর	০	০	+৪
ঝালকাঠি	০	-১	+৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-২	+৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

৭ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২৩
পৌষ-মাঘ ১৪২৯
জুমাদাল আখেরাহ-রজব
১৪৪৪

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
আমলের গ্রহণযোগ্যতায় নিয়্যতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৮) ০৭
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» বেশি সুবিধা কল্যাণকর নাও হতে পারে ১১
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৪তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২১তম পর্ব) ১৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» ইসলামে শূকরের গোশত হারাম কেন ১৬
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» ইছলাহ হোক আল্লাহর জন্যে ১৯
-আকরাম হোসেন

» 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নিয়ে বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা ২১
-মো. হাসিম আলী

» জুমআর দিনের আদব ২৪
-মো. দেলোয়ার হোসেন

» পড়াশোনা ও ভালো ফলাফলের কৌশল ২৭
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» হিংসা : কারণ, নিদর্শন ও প্রতিকার ২৯
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা
» বিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন ৩৩
-মাযহারুল ইসলাম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» ভার্চুয়ালে যেভাবে আপনি গুনাহগার হচ্ছেন ৩৫
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

◈ জামি'আহ পাতা ৩৭
» ঝরে যাক জীবনবৃক্ষের গুনাহপাতা
-আবির

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪০
» এক বৃদ্ধ বাদামওয়ালার গল্প
-সাদিয়া আফরোজ

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

নববর্ষ : আমাদের করণীয়

মানুষ অন্ধকারের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অকল্যাণের পথে ছুটে চলেছে নিরন্তর। ঈমান ও আমলের চিন্তা নেই। পরকালের জবাবদিহিতার ভয় নেই, বরং অর্থহীন নববর্ষ উদযাপনে ব্যস্ত। বছর শেষে নতুন বছর আসে কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। নববর্ষ পালন কতটা যৌক্তিক সে ভাবনা তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না! বরং অনাগত বছরের শুধুই ইতিবাচক স্বপ্ন দেখে। বিগত দিনের কৃত ভুলের জন্য কোনো অনুশোচনা নেই, সংশোধন হওয়ার কোনো চিন্তা নেই; মুখে শুধু 'শুভ নববর্ষ'!

নববর্ষে পৃথিবী নতুন রূপে সাজে, এই দিনে সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়, নতুন বর্ষের উদযাপন সুন্দর হলে পরবর্তী বছরটি সুখের হবে— এমন বিশ্বাস শিরক। কেননা সময়ের নিজের কোনো ক্ষমতা নেই; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় আবর্তিত হয় *(বুখারী, হা/৪৮২৬)*। নববর্ষে ধরণি জীর্ণতা-শীর্ণতা থেকে মুক্তি পায় এই বিশ্বাসে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি ভুলে বিজাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতির অনুসরণে নেচে-গেয়ে বরণ করতে হবে— এমন কথা ইসলামে নেই। বরং বিশেষ কোনো সময়কে শুভ বা অশুভ মনে করা কুসংস্কার। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সংক্রামক কোনো ব্যাধি নেই আর শুভ অশুভ কোনো লক্ষণ নেই' *(বুখারী, হা/৫৭৭৬)*।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে নববর্ষের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। এটি অন্য সব সাধারণ দিনের মতোই। এই কারণে ছাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী সময়ের কোনো বিদ্বান নববর্ষের উদযাপন করেননি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্ম, হিজরত, নবুঅত ও মৃত্যুদিবস পালন করেননি। এমনকি তিনি এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনাও প্রদান করেননি। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কেউই উদযাপন করেনি। বরং ইসলামে নতুন কোনো কর্ম বা বিশ্বাস আবিষ্কার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য' *(বুখারী, হা/২৬৯৭)*। এ কারণে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরী বর্ষের প্রচলন করলেও তার নববর্ষ উদযাপন করার প্রথা চালু করেননি।

তাছাড়া নববর্ষ উদযাপন মানে বেলেল্লাপনার সর্বনিম্ন সীমায় নেমে যাওয়ার নামান্তর। এই রাতে রাত বারোটার পর থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপনে ব্যান্ড পার্টির গান-বাজানো, আতশবাজি ও পটকা ফুটিয়ে পরিবেশ নষ্ট করা, নাচ-গান করে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মতো অসামাজিক জঘণ্য কাজগুলো সংঘটিত হয়, যা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম। বিশেষ করে নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম মাধ্যম হলো কোনো নারীকে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন করে উপস্থাপন করা; সৌন্দর্য প্রদর্শনের নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষের পাশে তাকে উপস্থিতি করে যেনা-ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে ফেলা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পর পুরুষের উপর নারীর চাইতে অধিক ক্ষতিকারক কোনো ফেতনা রেখে যায়নি' *(বুখারী, হা/৫০৯৬)*।

বিধর্মীদের ইসলামের বিধান অস্বীকার করাতে ইসলামের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু মুসলিমরা যখন তাদের এই অসার চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করবে, তখন কী হবে? তখন তো তাদের উপর আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে। পদে পদে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। সেই অবস্থায় আজ তারা এসেই পড়েছে! আল্লাহ ক্ষমা করুন। সত্য কথা বলতে মুসলিমদের একটা বড় অংশ দুনিয়ায় আয়-উন্নতি বুঝে; তারা এয়ো বুঝে যে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। দুনিয়ায় লাগামহীন চলার অবারিত সুযোগ আছে। কিন্তু এই জীবন কোনো মুসলিমের জন্য নয়। কেননা, তাকে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনিত বিধানের অনুগত হয়' *(আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসিম, হা/১৫; বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলা সুনানে কুবরা, হা/২০৯)*।

কিন্তু মুসলিমদের চরম শত্রু শয়তান ও ইসলামবিদ্বেষীরা বুঝালো— 'আবদ্ধ জীবন কতইনা কষ্টদায়ক! একমাত্র ধর্মান্ধ ও গোঁড়া ছাড়া কি কেউ এমন আবদ্ধ জীবনযাপন করতে চায়! কাজেই ধর্মন্ধতা ও গোঁড়ামি বর্জন করো আর সুখ-সমৃদ্ধি ও আনান্দভরা জীবন উপভোগে মেতে উঠো। আবদ্ধতার সীমানা ডিঙিয়ে মনের ইচ্ছা ও স্বপ্ন পূরণ করো'। দেখুন! কত বড় আহম্মক হলে এমন কথা বলে!? যেখানে জীবনই অনিশ্চিত, সেখানে স্বপ্ন, পরিকল্পনা আর বল্গাহীন বিলাসিতার আহ্বান?! আজ যে কত আল্লাহর বান্দা পথে ঘাটে ও সোশাল মিডিয়ায় happy new year বলছে- এগুলো ঐ সীমা অতিক্রমের অন্যতম বিষধর ফসল ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতকে কষ্টদায়ক বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আর জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও লালসার চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে' *(বুখারী, হা/৬৪৮৭)*।

আমরা যদি এ ক্ষেত্রে সজাগ হই, আমাদের পরিবার ও সন্তানের নিয়ন্ত্রণে কঠোর হই, তবে আরও বড় বড় ফেতনা সংগঠিত হওয়া থেকে রক্ষা পাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন! আল্লাহ তাআলার আইন লঙ্ঘন করলে পার্থিব জীবনেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে আর পরকালে তো আরও ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে এর বেদনাদায়ক প্রভাব সামাজ ও রাষ্ট্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু আফসোস, আমাদের চেতনা করে ফিরে আসবে!? কবে আমরা সতর্ক হব!?

আমলের গ্রহণযোগ্যতায় নিয়্যতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَت هِجرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ.

সরল অনুবাদ : উমার ইবনু খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কাজ নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর। আর মানুষ তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়্যত করবে। অতএব, যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও তাঁর রাসূলের জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করা হয়েছে তার জন্যই হবে’।[১]

নিয়্যতের শাব্দিক ও বিশেষ অর্থ :

নিয়্যতের আভিধানিক অর্থ : ইচ্ছা পোষণ করা, দৃঢ় সংকল্প করা। নিয়্যতের আরও বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন-

(১) কোনো কাজকে কোনো কাজ থেকে পৃথক করা, নির্দিষ্ট করা। এ অর্থেই বলা হয়, ‘যোহরের নিয়্যত করা’ অর্থাৎ অপর ছালাত হতে কেবল যোহরকেই নির্দিষ্ট করা। ‘ফরযের নিয়্যত করা’ অর্থাৎ সুন্নাত বা নফল ব্যতীত কেবল ফরযকেই নির্দিষ্ট করা।[২]

(২) কার্য সম্পাদনের সংকল্প করা। যথা– হজ্জের নিয়্যত করা। অর্থাৎ হজ্জ সম্পাদনের সংকল্প করা। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিয়্যত বলতে অন্তরের সংকল্পকে বুঝায়।[৩]

(৩) কোনো কার্য সম্পাদনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সংকল্প করা এবং এর ব্যত্যয় না ঘটানো।

(৪) কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

মোটকথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্য কোনো কাজ করার সংকল্পকে নিয়্যত বলা হয়। মুহাদ্দিছগণের বক্তব্যে নিয়্যতের এই অর্থটি উদ্দিষ্ট হয়েছে। এখানে এই শেষোক্ত অর্থেই নিয়্যত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘কাজ নির্ভর করে’ অর্থাৎ কাজের ছওয়াব নির্ভর করে।

‘হিজর’ অর্থ- ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। শরীআতে এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মীয় বিধান অবাধে পালনের উদ্দেশ্যে বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তার কিছু ছাহাবী এ উদ্দেশ্যেই জন্মস্থান মক্কা ত্যাগ করে মদীনা গমন করেছিলেন, তাই তাদের জন্মভূমি ত্যাগ হিজরত নামে খ্যাত।

(২) শরীআতে নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রকৃতার্থে মুহাজির সে, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে ত্যাগ করে’।[৪]

‘নারীকে বিবাহ করার নিয়্যতে’ এতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা অনারব ও দাসদেরকে হেয় মনে করত আর তাদের সাথে কন্যা সন্তানের বিবাহ দেওয়া হতে বিরত থাকত। ইসলাম সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করায় আরবরা দাস ও অনারবদের সাথে কন্যাদের বিবাহ প্রদান আরম্ভ করে। ফলে কোনো কোনো অনারব ও দাস আরব মহিলা বিয়ের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করে। হাদীছে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া উম্মে ক্বায়েস নামের এক সুন্দরী নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির মদীনা হিজরতের সূত্রটি নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি।[৫]

হাদীছটির আলোকে শিক্ষা :

(১) নিয়্যত অন্তরের সংকল্পেরই নাম। সুতরাং কোনো বিষয়ের সংকল্প অন্তরে করলেই চলবে, মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই।

(২) কোনো কোনো কাজ একাধিক নিয়্যত বা উদ্দেশ্যেও করা যেতে পারে। যথা– দরিদ্র আত্মীয়কে দান করা। এতে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা– উভয় উদ্দেশ্যই একসাথে থাকতে পারে।

(৩) মুবাহ কাজের জন্যও আল্লাহর কাছে ছওয়াব পাওয়া যেতে পারে, যদি তা নেক নিয়্যতে করা হয়। ব্যাবসাবাণিজ্য, চাষাবাদ, শ্রম ইত্যাদি।

নিয়্যতের গুরুত্ব : এই হাদীছের আলোচ্য বিষয় তিনটি। যথা-

(১) নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ইবাদত সম্পাদন।

(২) নিয়্যত ব্যতীত কোনো আমল ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।

(৩) আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিয়্যতের প্রভাব।

ইসলামে নিয়্যতের গুরুত্ব অত্যধিক। কোনো কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে নিয়্যত করা অপরিহার্য। নিয়্যত ব্যতীত শরীআতের কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়। যে কোনো

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭; মিশকাত, হা/১।

২. ইবনে রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৪৩।

৩. নববী, শারহু মসলিম, ১৩/৪৮।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১০।

৫. ইবনে রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৩৫।

আমলের পুরস্কার অথবা শাস্তি নিয়্যতের ভিত্তিতেই হয়। নিয়্যত ভালো হলে প্রতিদানস্বরূপ পুণ্য আর খারাপ হলে শাস্তিস্বরূপ পাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। কাজেই আমলের খারাপ বা ভালো হওয়া কিংবা গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য হওয়া সবই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। তাইতো 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত' বলে শারঈ আমলকে নিয়্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।[৬]

ভালো নিয়্যতের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করেও পুরস্কার পাওয়া যায়।[৭] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরতের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলো। অতঃপর রাস্তায় তার মৃত্যু হয়ে গেল, তবে আল্লাহর উপর তাকে প্রতিদান দেওয়া ধার্য হয়ে গেল' *(আন-নিসা, ৪/১০০)*। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছু ছাহাবীকে উদ্দেশ্যে করে মদীনায় অবস্থানরত ছাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করেও তোমাদের মতো প্রতিদান পাবে'।[৮] আবার খারাপ নিয়্যতে ব্যর্থ হলেও শাস্তি পেতে হয়।

নিয়্যতের উদ্দেশ্য : নিয়্যতের মাধ্যমে আমলকে এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর জন্যই আমল করা। কেননা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আমলের পুরস্কার তাঁর নিকট পাওয়া যাবে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টি অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আমলের পুরস্কার তার নিকট পাওয়া যাবে না। অন্য উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আমলের পুরস্কার তাঁর নিকটে চাওয়া হলে তিনি বলবেন, যার উদ্দেশ্যে তুমি এই আমল করেছিলে তার নিকটেই এর প্রতিদান অন্বেষণ করো। অর্থাৎ আমলের মূল্যায়ন অন্তরে সংকল্পিত উদ্দেশ্যের আলোকে হয়। অর্থাৎ যে কোনো সৎকাজের বিনিময় পেতে হলে উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ হতে হবে। সৎ ও যথাযথ নিয়্যত ব্যতীত কোনো আমলই সঠিক বা পুণ্যবহ হবে না।

কুরআন ও হাদীছের বর্ণনায় নিয়্যতের গুরুত্ব : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের কেউ দুনিয়া প্রত্যাশা (ইরাদা) করে আর কেউ আখেরাত প্রত্যাশা (ইরাদা) করে' *(আলে ইমরান, ৩/১৫২)*। আয়াতে 'ইরাদা' দ্বারা এই অর্থই উদ্দেশ্য। এমনিভাবে হাদীছের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়্যত শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা একনিষ্ঠভাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় না'।[৯] উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হাদীছটি এই অর্থকেই সমর্থন করে। উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং একটি রশি (দুনিয়াবী স্বার্থ) পাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাহলে সে তাই পাবে যার নিয়্যত সে করেছে'।

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে, নিয়্যত ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সালাফে ছালেহীন ও উলামায়ে কেরামের নিকট হাদীছটির গুরুত্ব : এই অর্থে নিয়্যতের ব্যবহার সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যে ব্যাপক পাওয়া যায়। যেমন- উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়্যত করবে না তার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ভালো করে নিয়্যত শিখো। কেননা সেটা আমলের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ'।[১০] সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নিয়্যতের চাইতে আমি আমার জন্য কোনো বিষয়কে কঠিন করে দেখিনি। কেননা সেটা আমলের উদ্দেশ্যের সাথে পরিবর্তন হতে থাকে'।[১১] তাই পবিত্রতার কোনো বিধানই নিয়্যত ছাড়া বিশুদ্ধ হবে না এবং ছালাত, যাকাত, ছওম ও হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতের কোনোটিই নিয়্যত ছাড়া আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুধী পাঠক! নিয়্যতের গুরুত্ব উপলব্ধি, বিদ্যা অর্জন এবং অন্যান্য সকল কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করেন- এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য মুহাদ্দিছগণ তাদের কিতাবের প্রথমে নিয়্যত সংক্রান্ত হাদীছটি বর্ণনা করে থাকেন। মোদ্দাকথা, একজন মুসলিমকে এই শিক্ষা দেওয়া যে, তার সকল কর্মকাণ্ডের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

এই হাদীছটি ঐ সকল হাদীছের একটি যার উপর ইসলামের বিধিবিধান আবর্তিত হয়। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই হাদীছটি দ্বীনী জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ এবং ফিক্বহের ৭০টি অধ্যায়ের মাসআলার উৎস'।[১২] ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইসলামের সকল বিধানের উৎস হিসেবে বর্ণিত তিনটি হাদীছের অন্যতম এটি'।[১৩]

নিয়্যতের সম্পর্ক অন্তরের সাথে : আলোচ্য হাদীছে মুহাদ্দিছগণের

৬. আরশীফ, মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, পৃ. ২৬৯; ইবনে দাক্বীকুল ঈদ, আহকামুল আহকাম, ১/৮।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৩৯।
৯. নাসাঈ, হা/৩১৪০, হাদীছ ছহীহ।
১০. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মুনতাহাল আমাল, পৃ. ৭।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
১৩. প্রাগুক্ত।

ব্যাখ্যা হতে সুস্পষ্টতই জানা যায়, নিয়্যত অন্তরের বিষয়, মুখে উচ্চারণের বিষয় নয়। যে কোনো আমল আরম্ভ করার পূর্বে নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করতে হবে মর্মে শারঈ কোনো প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন রাহিমাহুমুল্লাহ-এর আমলেও মুখে নিয়্যত উচ্চারণের প্রমাণ নেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখে উচ্চারণ না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ রয়েছে'। বহু গ্রন্থ প্রণেতা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'মুছল্লী মনে মনে ছালাতের নিয়্যত করবে যে, আমি যোহরের ছালাত পড়ছি। তারপর আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধলেই হয়ে যাবে। সমাজে প্রচলিত লম্বা-চওড়া নিয়্যত পাঠের প্রয়োজনীয়তা নাই'।[১৪] মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'অন্তরেই ছালাতের মনস্থ করে নিতে হবে। অর্থাৎ মনে মনে ধারণা করবে যে, আমি ফজরের ছালাত আদায় করছি। মুখে নিয়্যত করার কোনোই প্রয়োজন নেই'।[১৫]

শরীআতের আলোকে মানুষের কার্যাবলি তিনভাগে বিভক্ত : গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষ যে আমল সম্পাদন করে তা তিনভাগে বিভক্ত। যথা- (১) সাইয়েআত বা মন্দ কাজগুলো (২) হাসানাত বা ভালো কাজসমূহ (৩) মুবাহাত বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের কাজসমূহ।

কুরআন-হাদীছে যেসব কাজকে স্পষ্ট ভাষায় গুনাহের বলা হয়েছে, তাকে সাইয়েআত বলা হয়। যথা– সূদ, ঘুষ, যেনা, জুয়া, মদ, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কুরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ইত্যাদি। নিয়্যত দ্বারা পাপ কাজকে কিছুতেই নেকীর কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। যেমন- 'কাউকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে অন্যের সমালোচনা, অসহায়কে দানের উদ্দেশ্যে চুরি করা, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের জন্য আত্মসাৎ করা জায়েয নয়। অধিকন্তু যদি কেউ এরূপ কাজ ছওয়াবের আশায় করে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিষিদ্ধ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। যেমন কেউ বলছে, আমি মিষ্টির স্বাদ পাওয়ার জন্য নিম ফল খাচ্ছি! এমন ব্যক্তি সমাজে কেবল বোকাই হবে না, বরং পাগল বলে গণ্য হবে। এ জন্যই শরীআতে এরূপ ব্যক্তিকে শুধু ফাসেক্বই নয়, বরং কাফের বলা হবে। কারণ সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করেছে।[১৬] এমনিভাবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস। আল্লাহ বলেন, 'ঐ শ্রেণির ছালাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে গাফেল' *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৬)*।

যে সমস্ত কাজ শরীআত পালন করতে বলেছে বা ভালো বলে উৎসাহিত করেছে, তাকে 'হাসানাহ' বলা হয়। যেমন- ইবাদত পালন করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করা, গরীবের সাহায্য করা ইত্যাদি। হাসানাহ পর্যায়ের কার্যাবলি অপরিহার্য পর্যায়ের হলে তাকে ফরয বা ওয়াজিব বলে। করার জন্য তাকীদ থাকলে তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয় এবং ভালো বলে উৎসাহ প্রদান করা হলে তাকে মুস্তাহাব বা নফল বলা হয়। এগুলো নিয়্যতের মাধ্যমে সৎ আমলে পরিণত হয়। নিয়্যত ব্যতীত আদায় করলে কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না। নিয়্যত কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য করতে হবে। যদি লোকদেখানের জন্য হয়ে থাকে, তবে তা পাপে পরিণত হবে।[১৭]

যেসব কাজে মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন, তাকে 'মুবাহ' বলে। যেমন– খাওয়া, চলা, জীবিকা উপার্জন করা ইত্যাদি। নিয়্যতের তারতম্য বিশেষভাবে মুবাহ পর্যায়ের কাজগুলোতেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। মুবাহ পর্যায়ের যেকোনো একটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যতে করলে তখন তা আর মুবাহ থাকে না, তা একটি ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

দুনিয়ার ফয়সালা বাহ্যিক অবস্থার উপর আর আখেরাতের ফায়সলা নিয়্যতের উপর হয়ে থাকে : বর্তমানে আমরা যে জগতে আছি, যেখানে আমাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এটাকে আলামে যাহের বা দৃশ্যমান জগত বলা হয়। এখানে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধ-বুদ্ধির সীমানা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখেই তার ব্যাপারে ভালো-মন্দের মন্তব্য করতে পারি এবং এরই ভিত্তিতে তার সাথে আমরা আচরণ করে থাকি। বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের বাইরে তার নিয়্যত, অন্তরের রহস্য ও মনের গোপন অবস্থা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। এ জন্যই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'বাহ্যিক অবস্থার উপর বিচার করা, আর গোপন অবস্থা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই হলো আমাদের কাজ'।

কিন্তু আখেরাতে বিচারক হবেন আল্লাহ তাআলা, যিনি সকল গোপন বিষয় সম্যক অবগত। তাই সেখানে মানুষের নিয়্যত ও তার মনের ইচ্ছা বিবেচনায় সকল বিচার ও সিদ্ধান্ত হবে। তাই মনে রাখতে হবে, এই জগতে বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যিক আমল ও কর্মই যেমন মূল বিষয়, অনুরূপভাবে

১৪. বেহেশতী জেওর, ২/১৭-১৮।
১৫. রাহে নাজাত, পৃ. ৯।
১৬. ইমাম গাজালী, ইহইয়ায়ু উলূমিদ দীন, ৪/৩৮৮।
১৭. প্রাগুক্ত।

আখেরাতে নিয়্যতই হবে বিচার ও ফয়সালার উৎস। সেখানে বাহ্যিক আমল ও কর্মকে কেবল নিয়্যতের অনুগামী হিসেবে গণ্য করা হবে।[১৮]

হাদীছটি কুরআনের মর্মার্থের ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু বর্ণনা করেন তা কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার ব্যাখ্যা। সকল আমল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহে সে বিষয়ে ব্যাপক তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'তারা শুধু এজন্যই আদিষ্ট হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে তাঁর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করবে, ছালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। আর এটিই হবে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন' *(আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৫)*। অপর আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মুনাফেক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে আর আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। তবে যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে এসেছে, নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে আর দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করেছে তারা মুমিনদের সাথে থাকবে আর শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন' *(আন-নিসা, ৪/১৪৫-১৪৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূল! আপনি বলুন আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম' *(আল-আনআম, ৬/১৬২-১৬৩)*। এতে বুঝা গেলো, মানুষের যাবতীয় জন্ম, মৃত্যু ও সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। নিয়্যতের হাদীছসহ এ জাতীয় অন্যান্য সকল হাদীছ প্রকৃত অর্থে এই সমস্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

কুরআন মাজীদে একনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠতাবিহীন আমলের দৃষ্টান্ত : পবিত্র কুরআনের নিম্নের দুটি আয়াতে দানকারী দুই শ্রেণির মানুষের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে ঐসব লোক, যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদ কল্যাণখাতে ব্যয় করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে ঐ সকল মানুষ, যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের ধনসম্পদ গরীব, মিসকীন ও অভাবীদের প্রদান করে। এ দুই শ্রেণির মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখতে সম্পূর্ণ একই মনে হয়। কিন্তু যেহেতু তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাই তাদের আমলের ফলাফলও ভিন্ন হবে। এক শ্রেণির মানুষের আমল বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ, আর অপর শ্রেণির মানুষের আমল সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বিনষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মতো নিজেদের দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করো না, যে নিজের ধনসম্পদ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, তার দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর কিছু মাটি জমে গেল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো আর একে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তাই এ ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জিত সম্পদের কোনো বিনিময় লাভ করতে পারবে না। আর আল্লাহ এই অকৃতজ্ঞদেরকে হেদায়াত বঞ্চিত রাখবেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৪)*। অপরদিকে মুখলেছদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করে– তাদের দৃষ্টান্ত টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এর ফলে উৎপাদন দ্বিগুণ হয়...' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৫)*।

এখানে প্রথম জনের মানুষের নিকট সাময়িক বাহবা কুড়ানো ছাড়া আর কিছুই লাভ হলো না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তার নিয়্যতের আলোকে ফল দান করেছেন। সারকথা, এটিই হচ্ছে আল্লাহর নীতি ও বিধান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ হাদীছে এ কথাটিরই ঘোষণা দিয়েছেন।

ইখলাছশূন্য সৎ আমল বিরাট হলেও তার পরিণাম জাহান্নাম : একটি হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। আল্লাহর আদালতে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ফয়সালা দেওয়া হবে। সবার প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিল। সে যখন আদালতে হাযির হবে, তখন আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাকে নিজের নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও এগুলো স্মরণ করে স্বীকার করে নিবে। তারপর তাকে বলা হবে– বলো তো, তুমি কি এগুলোর হক্ব আদায় করেছ আর কী কাজ করে এসেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার পথে জিহাদ করেছি এমনকি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যেই জিহাদ করেছিলে যে, সে ব্যক্তি খুব সাহসী যোদ্ধা, আর দুনিয়াতে তুমি বীরের মর্যাদা পেয়েছ। এরপর তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(দারসে হাদীছ-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

১৮. মাআরেফুল হাদীছ, ১ম খণ্ড।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৮)

অতএব, ‘এহ নাম পারবতন বেধ নয়’।[১] কারণ নাম কোনো কিছুর বাস্তবতা বদলায় না। আর বাহ্যিক রূপ অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিফলন। যে ব্যক্তি বিবর্ণ মুচকি হাসি দিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে, সে তা কেবল এজন্য করে যে, তার মধ্যে দলের সদস্যদের প্রতি ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা ও পক্ষাবলম্বন গ্রোথিত রয়েছে। যেহেতু তার চোখ আপনার চোখে পড়েছে, তাই সে এমন হাসি দিতে বাধ্য হয়েছে। আপনি তাকে না দেখলে কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো।

আর এই ব্যাপারটা কিন্তু অসত্য কিছু নয়। কারণ ‘এখন এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবেগমূলক, উপলব্ধিমূলক ও চিন্তামূলক নানা উপাদান দ্বারা মানুষের অনুভূতি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এই উপাদানগুলো ব্যক্তির চালচলন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। চরমপন্থী দলগুলোর প্রতি অন্ধভক্তদের ব্যাপারে অথবা বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ক্ষেত্রে যাদের দল মরিয়া, তাদের ব্যাপারে যেসব গবেষণা চালানো হয়েছে, তা স্পষ্ট প্রমাণ করেছে যে, এসব ব্যক্তি কেবল সেসব বিষয় উপলব্ধি করে থাকে, যেগুলোর সাথে তাদের দলের সম্পর্ক রয়েছে। যেসব বিষয় তারা শোনে বা দেখে, সেগুলোর মধ্যে তারা কেবল সেটুকুই মনে রাখে, যেটুকু তাদের দলের পক্ষে যায়। কিন্তু যেসব বিষয় তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, অথবা সেগুলো দ্রুত ভুলে যায়, অথবা যে কোনো মূল্যে সেগুলোর বিকৃতি ঘটায়, যাতে সেগুলো তাদের চিন্তাচেতনার সাথে মিলে যায়’।[২]

নিঃসন্দেহে হিযবিয়্যাত বা দলাদলি উপর্যুক্ত মানসিক প্রভাব ও আচরণের নিকৃষ্টতম ক্ষেত্র।

‘অতএব, আক্বীদা ও মৌলিক বিষয়াবলিতে মতভেদ রাজনৈতিক দলাদলি সৃষ্টির পুঁজি হওয়া উচিত নয়[৩]। কারণ এটা কখনই বিবেকের কথা হতে পারে না যে, এ ধরনের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার জন্য পথ প্রশস্ত করা হবে এবং সেটা চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হবে। তা করা হলে এই ভ্রষ্টতা বড় হবে, বৃদ্ধি পাবে, ডিম দিবে এবং বাচ্চাও ফুটাবে; এমনকি একটি দল হয়ে প্রচার-প্রচারণা শুরু করবে এবং সিঁড়ি বানিয়ে তা দিয়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির স্থানে পৌঁছে যাবে এবং এর ভিত্তিতে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবে!

আল্লাহর কসম! এটা একটা ভয়ানক ব্যাপার। এটা মুসলিমদের জন্য অকল্যাণ ও ক্ষতি ছাড়া কিছুই বয়ে আনতে পারে না।

বারবার মুসলিমরা এই মতভেদের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করেছে। এটা মুসলিম উম্মাহকে যৌবনেই অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ রক্ষা না করলে এবং এর স্থায়িত্ব[৪] নির্ধারণ করে না দিলে আল্লাহর শত্রুদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ত এবং দৃশ্যমান হওয়ার পর তারা পুরাতত্ত্বে পরিণত হতো।

অতএব, কীভাবে এসব মতবিরোধকে দলাদলি তৈরির পুঁজি হিসেবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে?!

নিশ্চয়ই **এগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের উপর কঠিন বিপদ এবং মুসলিম দেশগুলোর সোজা পথে চলার ক্ষেত্রে বিরাট বাঁধা।** এগুলো মুসলিম উম্মাহর শক্তি সঞ্চার ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রেও বড় বাঁধা। এগুলো মারাত্মক অকল্যাণ, যার চেয়ে অকল্যাণ আর হতে পারে না। এগুলো কঠিন রোগ, যার চিকিৎসা নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে মুক্ত’।[৫]

এসব হিযবিয়্যাত বা দলাদলির আবার বহু বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দলাদলির বিধিনিষেধ

ইমাম আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ، فَجَالِسْ غَيْرَهُ ‘তুমি যদি তোমার শিক্ষকের

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৪৭০।

২. ইসলামী মনোবিদ্যার অগ্রদূত প্রফেসর ড. মালেক বাদরীর বক্তব্য থেকে গৃহীত। দ্র. মুহাম্মাদ মুছতফা আ‘যমী, মানহাজুন নাক্বদ ইনদাল মুহাদ্দিছীন, পৃ. ৪১।

৩. অরাজনৈতিক দলাদলিও।

৪. অন্যের বিপদে উল্লসিত মানুষ ও শত্রুরা থাকা সত্ত্বেও।

৫. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ২৫।

ভুল জানতে চাও, তাহলে অন্যের সাহচর্যে বসো’।[৬]

একারণে দলবাজরা তাদের অনুসারীদেরকে অন্যদের সাহচর্যে যেতে নিষেধ করে, যারা তাদের সাথে নেই বা তাদের সমর্থক নয়!!

যদি (দলে) তাদের পদোন্নতি ঘটে, তাহলে বহু শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে অন্যদের সাথে মেশার অনুমতি দেওয়া হয়। এসব শর্ত ও বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মগজে পর্দা টেনে দেওয়া, যাতে তা তাদের তরীক্বার বিপরীত এবং তাদের বিদ‘আত পরিপন্থী কথা শুনতে বাধা সৃষ্টি করে।

আর এর মাধ্যমে তারা আসলে বিভিন্ন ছূফী তরীক্বার অনুকরণ করছে; অনুসরণ করছে পীর-মুরীদীর কুসংস্কারের। ‘ইসলামী বায়‘আতের ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গৃহীত শর্ত কোথায় আর মুরীদের জন্য পীর কর্তৃক গৃহীত শর্ত কোথায়!’[৭]

ইমাম সুয়ূত্বী[৮] রাহিমাহুল্লাহ-কে ছূফীদের কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে, অতঃপর আরেকজন পীর ধরে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এক্ষণে, প্রথম অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, না-কি দ্বিতীয়টি?

জবাবে তিনি বলেন, لَا يَلْزَمُهُ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ، وَلَا الثَّانِيْ، وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ ‘তার উপর প্রথম অঙ্গীকার[৯] বাস্তবায়ন করাও আবশ্যক নয়, দ্বিতীয়টিও নয়। এর কোনো ভিত্তি নেই’।[১০]

অতএব, এসব বিধিনিষেধ, শর্ত ও সীমাবদ্ধতা বাতিল। কুরআন ও সুন্নাহয় এসবের কোনো ভিত্তি নেই। আর كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ‘আল্লাহর কিতাবে নেই এমন প্রত্যেকটি শর্তই বাতিল, যদিও তা একশ শর্ত হয়’।[১১]

দলাদলির নিকৃষ্ট ও হতাশাব্যঞ্জক একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, **শারঈ ইলমের গুরুত্ব কম দেওয়া**। মনে রাখতে হবে, ইলম এক জিনিস, আর বক্তব্য আরেক জিনিস। সালাফে ছলেহীন বা পূর্বসূরীগণ ছিলেন উপকারী ইলমের অধিকারী। আর উত্তরসূরীগণ হচ্ছে প্রচারিত বক্তব্যের বক্তা। পূর্বসূরীগণের ইলম ছিল স্বল্পবাক্য, বরকতময় ও পর্যাপ্ত। আর উত্তরসূরীগণের ইলম হচ্ছে অধিকবাক্য ও অল্প উপকারী।

মুসলিম জাতি ইলম ও আমলের জাতি। তাদের ইলম হচ্ছে দলীল ও মূল। (মহান আল্লাহ বলেন,) ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ‘আর বলুন, হে আমার রব! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’ *(ত্ব-হা, ২০/১১৪)*। (তিনি আরো বলেন,) ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ‘কেবল আলেমগণই তা বোঝেন’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৩)*। (তিনি আরো বলেন,) ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ‘বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?’ *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*। (মহান আল্লাহ আরো বলেন,) ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন’ *(আল-মুজাদিলাহ, ৫৮/১১)*।

আপনি নিশ্চয় এমন কিছু উক্তিকারীকে পাবেন, যে পরিবেশ-পরিস্থিতি জানার নামে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও ময়দানে কাজ করার অজুহাতে ইলম অর্জনের বিষয়টি তুচ্ছ জ্ঞান করে...

---

৬. আদ-দারেমী, আস-সুনান, ১/১৫৩।

৭. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ২৫০। ওখানে আমি টীকায় বলেছি, ‘এই যুগের দলবাজরা যেসব শপথ, অঙ্গীকার ইত্যাদি গ্রহণ করছে, সেগুলোর রূপ ও নাম ভিন্ন হলেও নিশ্চিতভাবে সেগুলো বাতিল’।

৮. আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া, ১/২৫৩।

৯. এই ধরনের অঙ্গীকার বিদ‘আত ও বাতিল প্রমাণিত করে শায়খ শুক্বাইরীর লম্বা বক্তব্য আছে *(দ্র. আল-মিনহা আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ ফী বায়ানিল আক্বাইদিস সালাফিয়্যাহ, পৃ. ২৫৪-২৬৬)*।

১০. যা দলীয় ও সাংগঠনিকভাবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে, তাকে কেউ কেউ ‘অঙ্গীকার’ বা ‘বিশেষ বায়‘আত’ বা অনুরূপ কিছু বলে থাকে। আসলে এগুলোর কোনো ভিত্তিই নেই এবং এগুলো বিশুদ্ধ হওয়ার কোনো দিকও নেই। এক্ষেত্রে আমার পুস্তিকা ‘আল-বায়‘আতু বায়নাস সুন্নাতি ওয়াল বিদ‘আহ’ বইটি পড়া যেতে পারে। সেখানে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আমার ‘আল-বায়‘আতু’ শীর্ষক বইটি আল-হামদুলিল্লাহ বহুল প্রচারিত একটি বই এবং আলেমসমাজের নিকটও গ্রহণযোগ্য একটি বই। এ বইটিকে স্বীকৃতি দিয়ে এর দ্বারা উপকৃত হয়ে অনেক আলেম এখান থেকে তথ্য নিয়েছেন। ...কিন্তু হঠাৎ এক সম্মানিত ভাই এই বইটির প্রত্যুত্তরে কলম ধরেন। যেখানে তিনি ভালো-মন্দ একাকার করে ফেলেছেন এবং প্রত্যুত্তর ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আলেমগণের আদর্শের সীমালঙ্ঘন করেছেন। তিনি প্রবন্ধ আকারে সেটি ‘মাজাল্লাতুল বালাগ আল-কুয়েতিয়্যাহ’-তে প্রকাশ করেছেন *(দ্র. সংখ্যা ৮৯১, বর্ষ: ১৪০৭ হি.)*। আমি তার প্রত্যুত্তরে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করার জন্য বিস্তারিত লিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ আমার জন্য শায়খ আল্লামা বাকর আবু যায়েদ-এর একটি সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্যকে প্রত্যুত্তরের জন্য যথেষ্ট করে দিয়েছেন আল-হামদুলিল্লাহ। তিনি সেই ভদ্রলোকের সেই প্রত্যুত্তরের ব্যাপারে মন্তব্য করে লিখেছেন, كَلَامٌ مُتَهَافِتٌ ‘(এটি) স্ববিরোধী ও দুর্বল কথা’ *(দ্র. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৬৪)*।

১১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। শব্দচয়ন ইবনে মাজাহ-এর, হা/২৫২১।

কিন্তু তিনি কী দ্বারা বাস্তবতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি জানবেন?! তিনি কী দিয়ে দাওয়াত দিবেন?! তিনি কীসের মাধ্যমে কাজ করবেন?!

চিন্তার একটা সীমাবদ্ধ জায়গা রয়েছে, কিন্তু তা ইলম নয়। অগ্নিঝরা বক্তব্য জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু গঠন করতে পারে না। একগুঁয়ে কল্পনা মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তা খুব শিগগিরই চলে যায়। (মহান আল্লাহ বলেন,) ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ 'অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়' *(আর-রা'দ, ১৩/১৭)*।[১২]

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব বিধিনিষেধে কিন্তু তাদের সালাফ বা পূর্বসূরী রয়েছে। তবে সেই পূর্বসূরী কতই না নিকৃষ্ট! সেই পূর্বসূরী হচ্ছে ছূফী। ইবনুল জাওযী 'তালবীসু ইবলীস'[১৩] গ্রন্থে আবু আব্দিল্লাহ ইবনে খফীফ থেকে বর্ণনা করেন, اِشْتَغِلُوْا بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ كَلَامُ الصُّوفِيَّةِ فَإِنِّيْ كُنْتُ أُخَبِّئُ مَحْبَرَتِيْ فِيْ جَيْبِ مُرَقَّعَتِيْ وَالْكَاغَدَ فِيْ حِزَّةِ سَرَاوِيْلِيْ وَكُنْتُ أَذْهَبُ خِفْيَةً إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِذَا عَلِمُوْا بِيْ خَاصَمُوْنِيْ وَقَالُوْا لَا تُفْلِحُ 'তোমরা ইলম অর্জনে ব্রতী হও। ছূফীদের বক্তব্য যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে। আমি কিন্তু আমার দোয়াত আমার জোড়াতালিযুক্ত পোশাকের পকেটে এবং কাগজ আমার পাজামার খাঁজে লুকিয়ে রাখতাম। আমি সঙ্গোপনে আলেমগণের নিকট যেতাম। যখন তারা (ছূফীরা) আমার ব্যাপারে জানতে পারত, তখন তারা আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতো[১৪] এবং বলত, তুমি সফল হবে না'।

এরপর এই বিধিনিষেধ আরো উন্নত হয়ে[১৫] বর্তমান যুগে এর নানা রূপ তৈরি হয়েছে, দলাদলিই যেগুলোর আবিষ্কারক।

দলাদলি ও দলবাজরা যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছে, তন্মধ্যে ভয়ংকর একটি বিষয় হচ্ছে, নতুন নতুন পরিভাষা। যেমন- আন্দোলনের আলেম-উলামা, পরিস্থিতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম-উলামা, চিন্তাবিদ, সংগঠনের নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ইত্যাদি। এভাবে উম্মতকে তারা ধ্বংস করে ছাড়ে। তারা উম্মতকে শরী'আতের প্রকৃত আলেম-উলামা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছাড়ে।

ছূফীদের পরিভাষার সাথে উপর্যুক্ত পরিভাষার মিল আছে। তারা বলে, হাক্বীক্বতে অভিজ্ঞ আলেম এবং শরী'আতে অভিজ্ঞ আলেম। দলবাজ ও ছূফীদের পরিভাষার মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি হচ্ছে, শরী'আতের প্রকৃত আলেম-উলামা ও জনগণের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং এমন ইলমের দাবি করা, যেখানে শারঈ জ্ঞানে অভিজ্ঞ আলেমগণ পৌঁছতে পারেননি।

এগুলো আসলে আন্দোলনধর্মীদের ইলহাম ও অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো কেবল তাদের মাথা থেকে নিঃসরিত ভবিষ্যতমুখী মতবাদ, কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে পৌঁছতে অনুসারীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেজন্য আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[১৬]

ছূফীরা মানুষদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে পৃথক করার জন্য এবং তাদের ব্রেইনকে শিকলবন্দী করতঃ তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যেদিক ইচ্ছা সেদিক নেওয়ার জন্য এই পথ অনুসরণের বিকল্প কিছু খুঁজে পায়নি।

তারাই বলেছে, আন্দোলনে অভিজ্ঞ আলেম এবং শরী'আতে অভিজ্ঞ আলেম। এই ভাগের কারণেই আন্দোলনের আলেম-উলামা দ্বীনী কাজে লম্ফঝম্ফ করছে। আর পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতার অজুহাত দেখিয়ে শরী'আতের আলেমগণকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আরো নানা সংশয় সৃষ্টি করে যুবকদের কান ভারী করছে। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক প্রকৃত আলেমগণ থেকে দাওয়াতী কার্যক্রমকে আলাদা করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তারা ইলম ও শরী'আতের দায়িত্বশীলগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা উঠিয়ে দিয়ে আন্দোলন ও আন্দোলনকর্মীদের ঘিরে এবং তাদের তুচ্ছ সম্বল ইলহাম, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরে বলয় তৈরি করছে। যেমন- আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায, **আমাদের এ যুগের শায়খুল হাদীছ নাছিরুদ্দীন আলবানী,** শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছাইমীন, শায়খ মুক্ববিল ইবনে হাদি আল-ওয়াদেঈ সহ শরী'আতের ইনছাফপরায়ণ সকল আলেম।

যখন আপনি বলবেন, আল্লামা ইবনে বায বলেছেন, তখন তারা বলবে, তিনি পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ!![১৭]

---

১২. আয়েয আল-ক্বরনী, আল-হারাকাত আল-ইসলামিয়্যাহ আল-মু'আছেরাহ, পৃ. ১৬।

১৩. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস, পৃ. ৪৪৩।

১৪. আমি 'আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস'-এর এই জায়গায় টীকাতে লিখেছি, 'গতকালের সাথে আজকের কী অপূর্ব মিল! বর্তমান যুগের দলবাজদের বহুসংখ্যক এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু করছে। অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভালো কাজই করছে!

১৫. উন্নত হয়ে নয়; বরং জটিল হয়ে!

১৬. ইবনে গানেম প্রণীত 'তাফলীসু ইবলীস' বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় আমাদের সম্মানিত ভাই সালীম হেলালীর টীকার সাথে বিষয়টি মিলিয়ে দেখুন। সেখানে ঠিক এরকম বক্তব্যের দিকেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৭. তাদের কারো কারো পক্ষ থেকে এই 'বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি' (الواقع) শব্দটার মধ্যে সামগ্রিক ধোঁকা রয়েছে। এটা তখনই স্পষ্ট হয়ে যাবে, যখন আপনি এই 'বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি' সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তুলনা করে

আপনি যদি বলেন, শায়খ মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, তখন তারা বলবে, তিনি রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ!!

যদি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহও এখন বের হতেন, তবুও তারা তাকে অজ্ঞতার অপবাদ লাগাতো!!

বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আন্দোলনের আলেম ও আন্দোলনমুখীরা এখন দাওয়াতের কান্ডারি হয়ে গেছেন। আর শরী'আতের আলেমগণ এবং শারঈ জ্ঞানের ছাত্রগণ হয়ে গেছেন অনুসারীদের মতো, যাদের কোনো কথা শোনা হবে না!![১৮]

প্রত্যেকটা দলেই আপনি দলীয় মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি পাবেন। আক্বীদাগত বা আমলগত কোনো মাসআলাতেই একথা না বলা পর্যন্ত সে নিশ্চিত হতে পারে না যে, এই মাসআলায় দলীয় বিশেষ ব্যাপার রয়েছে। এই বিশেষ ব্যাপার সে ভবিষ্যত পরিকল্পনার চ্যানেলে আওড়াতে থাকে। ফলে তা ইলহাম, ধারণা, পরিকল্পনা ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে বের হয়। আর অমনিই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলবাজ লোক তা লুফে নেয়। অতঃপর খুব জোরেসোরে তা অনুসারীদের ব্রেইনে নিক্ষেপ করে।[১৯]

এ অবস্থায় সর্বনাশ হয়ে যাবে সে ব্যক্তির, যে সাহস করে দলীল চাইবে এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী আয়াত-হাদীছের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে সমালোচনা করবে। সে অচিরেই তার ভাইদের মাঝে রোগাক্রান্ত উটের মতো হয়ে যাবে!

ثُمَّ من نَاظر أَو جادل أَو ... رام كشفا لقذى لم ينجل

قَدَحُوا فِي دينه وَاتَّخذُوا ... عرضه مرمى سِهَام المنصل

(কবিতার সারাংশ): অতঃপর যে ব্যক্তি বিতর্ক করে বা বিবাদ করে বা অপরিস্ফুটিত ময়লা দূর করতে চায়, তারা তার দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা করে এবং তার সম্মানকে তীর নিক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে।[২০]

বুঝা গেল, অনুসারীরা কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য বক্তব্যের সাথে লেনদেন করতে ভয় পায় এবং আন্দোলন ও দলের আলেম ও ফক্বীহ-এর ইলহামী বক্তব্যের উপর নির্ভর করে। ঠিক যেমন ত্বরীক্বাপন্থী ছূফীরা কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য বক্তব্য দেখে ঘাবড়ায় এবং তারা পদস্খলিত হওয়ার ভয়ে দ্বীন বুঝতে হাক্বীক্বতের আলেমদের উপর নির্ভর করে। এসব তাদের ধারণা মাত্র!!

সম্মানিত মুসলিমগণ! কিছু নবাবিষ্কৃত, সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল, বিদ'আতী পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতের আলেমগণের সাথে যোগাযোগের মাঝে ও শরী'আতের প্রকাশ্য বক্তব্যের সাথে জীবনাচারের মাঝে এবং মানুষের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে!

অতএব, আপনাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, শরী'আতের আলেম-উলামা ও শারঈ জ্ঞানের ছাত্রদের মেনে চলা, তাদের সঙ্গে থাকা এবং তাদের কথা শোনা, যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে সব বিদ'আত ও কালিমা দূর করতে ব্যস্ত। সাথে সাথে মহান আল্লাহর এই বাণীটি স্মরণ করুন, ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ 'আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আস-সাজদাহ, ৩২/২২)*।[২১]

এভাবে 'নতুন নতুন পথ ও কাঠামোযুক্ত দলাদলি, যেগুলোর সাথে সালাফে ছালেহীন পরিচিত ছিলেন না, সেগুলো ইলমের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা এবং বিভক্তির ভয়ানক কারণ। এগুলো ইসলামী ঐক্যের রজ্জুকে কত-না দুর্বল করেছে এবং এর কারণে মুসলিমদের কত-না দুর্যোগ গ্রাস করেছে'।[২২]

এগুলো সবই 'দলাদলি ও অন্ধভক্তির অন্যতম বিপদ। অথচ বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জেনে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করলে মানুষের উপদেশ গ্রহণ ও সংশোধনের সামর্থ্য অর্জনের কথা ছিল'।[২৩]

কিন্তু দলবাজদের নিকট সংশোধনের ব্যাপারটা রহিত বা বিকৃত হয়ে গেছে। তারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছে!!

(চলবে)

দেখবেন- যে 'বর্তমান প্রেক্ষাপট' ঘিরে তাদের জল্পনা-কল্পনা, যেদিকে তারা আহ্বান করে। আমার 'ফিক্বহুল ওয়াক্বে' বায়নান নাযারিয়্যাতি ওয়াত-তাত্ববীক্ব' বইটিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

১৮. সেজন্য দলে থাকলে হীন ব্যক্তিকেও অগ্রগামী করা হবে; কিন্তু দলের বিরোধী ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত হলেও তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে!

১৯. ফলে তারা 'দলীল ছাড়াই তাদের পীরের অনুসরণ করে। পীর-মাশায়েখ যা করতে বলেন বা মুরীদরা তাদেরকে যা করতে দেখে, তারা তা-ই করে' *(দ্র. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৪৯৫)*।

২০. আল-বাদরুত ত্বলে', ১/১৩৬।

২১. উতাইবী, আত-ত্বলী'আহ ফী বারাআতি আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৩০-৩৩ (ঈষৎ পরিমার্জনসহ)।

২২. শায়খ বাকর আবু যায়েদ, হিলইয়াতু ত্বলিবিল ইলম, পৃ. ৬৫।

২৩. উমার উবাইদ হাসানাহ প্রণীত 'ফিক্বহুদ দাওয়াহ' কিতাবের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, ১/৮।

বেশি সুবিধা কল্যাণকর নাও হতে পারে

*-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ**

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখন তা তাদের আলো দেয়, তখন তাতে তারা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার করে দেয় তখন তারা দাঁড়িয়ে যায়। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুই-ই নষ্ট করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান' *(আল-বাক্বারা, ২/২০)*।

আয়াতের মর্মার্থ : এ আয়াতের মর্মার্থ হলো— মানুষ আলোর উপস্থিতিতে সবকিছু দেখতে পায়; অন্ধকারে কিছুই দেখে না। আবার আলোর ঝলক তীব্র হলে চোখের আলোগ্রাহী (Photoreceptor) কোষগুলো অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে, ফলে সে দেখে না। এছাড়াও মহান আল্লাহ যে কোনো সময় যে কোনোভাবে মানুষের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুটোই ছিনিয়ে নিতে পারেন। তিনি ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান।

আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা : আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক কোনো গ্রন্থ নয়; এটা আল্লাহর সর্বশেষ নবীর উপর সর্বশেষ প্রত্যাদেশ, যা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি মানুষের সামনে পেশ করেছেন। তবে এখানে বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট ৭৫০টি আয়াতের মাঝে অনেক তথ্য চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। যা পবিত্র কুরআনের মু'জেযাকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে। নিম্নে উপরিউক্ত আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলো।

চোখ, দৃষ্টিশক্তি ও আলো : আলোর মধ্য দিয়ে মানুষের চোখ দৃষ্টি সঞ্চার করে। দৃষ্টি সঞ্চারের সাথে অনেকগুলো আনুষঙ্গিক অঙ্গ জড়িত। যেমন কর্নিয়া, আইরিস, কোরয়েড, রেটিনা, লেন্স, পিউপিল, কনজাংটিভা, অ্যাকুয়াস হিউমার, ইত্যাদি। এসব অঙ্গের আচরণ ও কার্যপ্রণালী কিছু কিছু আবিষ্কৃত হলেও বেশির ভাগ অঙ্গের কার্যকারণ রহস্যময় রয়ে গেছে। চোখের গঠন এবং দেখার পদ্ধতি অনুকরণে আবিষ্কার হয়েছে ক্যামেরা। আমাদের চোখের সামনে আছে একটি লেন্স। এ লেন্স কিছু বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি ক্যামেরাতেও এমনি একটি কাচের লেন্স থাকে। এই লেন্সের মধ্যে কোনো জিনিসের উপর থেকে প্রতিফলিত আলো ঢুকে ক্যামেরার ফিল্মে পড়ে। আর তার উপরে ঐ বস্তুর একটা উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। চোখের মধ্যে ফিল্মের কাজ করে রেটিনা। রেটিনার চারপাশে কালো রঙের একটি স্তর থাকে। এর নাম কোরয়েড। চোখে আলো প্রবেশ করে পিউপিল দিয়ে। আলো বাড়া-কমা নিয়ন্ত্রণ করে আইরিস। আবার রেটিনার আছে আলো গ্রহণকারী কোষ। আলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি খুবই সংবেদনশীল। রেটিনা আলোক উদ্দীপনাবাহী জটিল সুসংঘবদ্ধ স্নায়ুকোষ এবং আলোক সংবেদীগ্রাহক কোষ সমন্বয়ে গঠিত। আলোক সংবেদীগ্রাহক কোষ দুই ধরনের। যথা :

১. কোন (Cones) Photochemical reaction Visual center) এবং ২. রড (Rods)।

১. কোন : সাধারণত দিনের আলোতে দেখতে সাহায্য করে এবং রং (Colors) সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে।

২. রড : রাতের অন্ধকারে এবং ক্ষীণ আলোতে দেখার জন্য অভিযোজিত।

কোষগুলো আলোর অনুভূতি দ্রুত মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে প্রেরণ করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেক জিনিসের ছবি রেটিনায় গিয়ে একটি উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি করে। কিন্তু মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রের সাহায্যে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোজা হয়ে যায়। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের কপালের নিচে যে দুটি চোখ দিয়েছেন, তার প্রতি ইঙ্গিত করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ 'আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়' *(আল-বালাদ, ৯০/৮)*। তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ 'বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(আল-মুলক, ৬৭/২৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ 'তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রূযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই-বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন আপনি

---

* সহকারী অধ্যাপক ও প্রধান মুফাসসির, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

বলুন, তারপরও তাক্বওয়া অবলম্বন করছ না?' (*ইউনুস, ১০/৩১*)। উপরিউক্ত দর্শনশক্তি অতি সূক্ষ্ম ও জটিল কলাকৌশলের অঙ্গীভূত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া সচল থাকে আল্লাহ পাকের নিয়মকানুনের ভিত্তিতে। এ অঙ্গটি বিকল হয়ে গেলে জগতে কেউ নেই নতুন করে তা সৃষ্টি করে দিতে পারে।

মানুষ কখন দেখতে পায় : কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক তরঙ্গ (Light waves) এসে কোন (Cones) এবং রড (Rods) কোষকে উদ্দীপিত করলে তবেই মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু সব ধরনের আলোক তরঙ্গ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যেসব তরঙ্গ ধরা পড়ে তাদের বলা হয় দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ। যার ব্যাপ্তি ৩৮০০ A^0 থেকে ৭২০০ A^0 তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে মধ্যে (1 Angstrom=10^{-8} cm)। আলোক তরঙ্গ চোখে পড়লে কোন (Cones) এবং রড (Rods)-এর যে রাসায়নিক পদার্থ আছে তা আলো শোষণ করে নেয়। কোন-এর আছে আয়োডোপসীস এবং রড-এর আছে রোডপসীন। আলোর ছোঁয়ায় এ রাসায়নিক বস্তু দুটির মধ্যে ফটোক্যামিক্যল বিক্রিয়ার (Photochemical reaction) কারণে আবেগ দৃষ্টি হলে তা স্নায়ুতন্ত্রর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (Visual Centre) পৌঁছে যায়। তখনই মানুষ দেখতে পায়। অন্ধকারে কোণ এবং রড আলো গ্রহণ করতে পারে না বলেই কিছুই দর্শন করা যায় না।

আলোর তীব্রতা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় : আলোর তীব্রতার প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আলোর তীব্রতার প্রেক্ষাপটে কোন ও রড খুব তীব্র আলোতে অসংবেদী হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ চমক হঠাৎ জোরালো আলো উৎপন্ন করে ক্ষীপ্র গতিতে ছড়িয়ে দেয়। এ সময় কোন এবং রড-এর দিক থেকে কোনো সাড়া না আসার দরুন মানুষের দৃষ্টি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের ফলে চলার পথে মানুষের দৃষ্টিশক্তির যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'ইয়াখতাফু' শব্দ দ্বারা তা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যা একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে আজ থেকে ১৪শ' বছর পূর্বের অবতীর্ণ আল-কুরআনের সাথে শতভাগ মিলে যায়।

উপর্যুক্ত আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা : আয়াতটি সূরা আল-বাক্বারা থেকে উৎকলিত। ২০ নং আয়াতের পূর্বে ১৪টি আয়াতই প্রথমে কাফের ও পরের ১৩টিতে মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তাদের মানসিকতার ধরন ও প্রকৃতির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কেমন মনোভাব পোষণ করেন ঐ সমস্ত আয়াতে তা ফুটে উঠেছে।

আয়াতটির প্রাসঙ্গিকতা : উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিক্বদের স্বার্থপরতা ও স্বভাবসুলভ প্রকৃতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যখন ইসলাম তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে মসৃণ মনে হয় তখন তারা ইসলামের সাথে থাকে। পক্ষান্তরে যখন ইসলামের কারণে কণ্টকাকীর্ণ জীবন বরণ করতে হয়, সমকালীন স্বার্থান্বেষী মহলের নিকট থেকে সম্মুখীন হতে হয় নানা বাধা-বিপত্তির ও জীবনে নানা স্তরে ইসলামী অনুশাসনের প্রতিপালনের কারণে বিরোধিতার অন্ধকার নেমে আসে, তখন সঠিক ইসলাম পালনের পথ থেকে তারা সরে পড়ে, ইসলামের মৌলিক চেতনা, ধ্যানধারনা ও বিশ্বাস থেকে তারা দূরে সরে যায়। তাদের সমস্যা হবে বলে মনে করে তারা ইসলামের ছহীহ ত্বরীক্বা থেকে সরে পড়ে বা নিজেদের আড়াল করে রাখে। অথচ আল্লাহ সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি চাইলে আড়াল করা অবস্থায়ও বিপদ দিতে পারেন। সমস্যা তৈরি হতে পারে। জীবন অতিষ্ঠ ও সংকটাপন্ন হতে পারে। এভাবে বেশি সুযোগ-সুবিধায় থেকেও মানুষ উপভোগের সুযোগ সংকুচিত হতে পারে। যেমনিভাবে আলোর কারণে মানুষ দেখতে পেলেও বেশি আলোতে বিদ্যুৎ চমকে আবার কিন্তু দেখে না। আর আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুই-ই যে কোনো সময়ে নষ্ট করে দিতে পারেন। সর্বোপরি মানুষের স্বার্থে ইসলামের নির্দেশনা পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জনের উপর কোনো কৃতিত্ব নেই; কৃতিত্ব সব আল্লাহরই। তাঁকে ঘিরেই যাবতীয় উপাসনা-আরাধনা হওয়া দরকার। তিনিই একমাত্র মহা পরক্রমশালী।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সুযোগের প্রাচুর্যে বসবাস করেও বিভিন্ন কারণে জীবনে সীমাবদ্ধতার দেয়াল তৈরি হতে পারে। আবার কম সুযোগ ও অতি নগণ্য আয়োজন মানুষকে তৃপ্ত ও প্রশান্ত করে দিতে পারে। মানুষের যাপিত জীবনে অলৌকিক অদৃশ্য এক মহান শক্তির সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও তাঁরই প্রদর্শিত-নির্দেশিত পথে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেক ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ঠিক রেখে ব্যক্তিগত তৎপরতা দিয়ে ইসলামের বিধানকে নিয়ন্ত্রণ বা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা নয়; বরং ইসলামের আলোকে নিজের জীবন পরিচালনা করা দরকার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সুবিধাবাদী ইসলাম থেকে বিরত থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন অতিবাহিত করে তাঁর রেযামন্দী হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৪তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২১তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

অনুবাদ :

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবদান হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে, তিনি যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আরো হাদীছ শুনিয়েছেন বিশর ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস ও মা'মার হাদীছ শুনিয়েছেন, তারা যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রামাযানে তিনি আরো বেশি দানশীল হতেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।]

রাবী পরিচিতি :

(১) আবদান :

তার প্রকৃত নাম নাম আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান। উপনাম আবূ আব্দুর রহমান এবং উপাধি আবদান। কেন তাকে আবদান নামে ডাকা হয় তা নিয়ে দুই ধরনের মত রয়েছে।

(ক) আরবীতে অনেক সময় নাম পরিচিত হয়ে গেলে নামকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। যেমন আলীকে আল্লান, আহমাদ ইউসুফ আস-সুলামীকে হামদান, ওয়াহহাব ইবনু বাকিয়্যাকে অহবান বলা হয়, ঠিক তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান রাহিমাহুল্লাহ-কে আবদান বলা হয়। আব্দুল্লাহ-এর আবদ আর উছমান-এর আলিফ-নূন মিলিয়ে আবদান।

(খ) মূলত তার নাম আব্দুল্লাহ এবং তার উপনাম আবূ আব্দুর রহমান। নাম ও উপনাম দুটোই আবদ দিয়ে শুরু হওয়ায় আবদ-এর দ্বিবচন আবদান নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, (২) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, (৩) হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, (৪) আব্বাদ ইবনুল আওয়াম, (৫) মালেক ইবনু আনাস, (৬) ইবরাহীম ইবনু সা'দ, (৭) জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) ইমাম বুখারী, (২) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আয-যুহলী, (৩) ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান আল-ফারেসী, (৪) হামেদ ইবনু মাহমূদ আল-মারওয়াযী, (৫) আহমাদ ইবনু সায়য়ার আল-মারওয়াযী, (৬) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সিবওয়াইহ আল-মারওয়াযী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

তিনি মযবূত ও গ্রহণযোগ্য রাবী। তিনি অনেক দানশীল ও মানুষের প্রতি সাহায্যপরায়ণ ছিলেন। যেমন তিনি নিজেই বলেন, مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ حَاجَةً إِلَّا قُمْتُ لَهُ بِنَفْسِي অর্থাৎ 'কোনো ব্যক্তি আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য এসেছে আর আমি নিজে তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য চেষ্টা করিনি এমনটা কখনোই হয়নি'। এই মহান মানুষটি ২২১ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে মারা যান।[১]

(২) আব্দুল্লাহ :

তার পূর্ণ নাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক আল-হানযালী আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফক্বীহ ও মুজাহিদ ছিলেন। তার পদচারণা শুধু ইলমের জগতে ছিল না, বরং তিনি যেমন দারসে হাদীছে মহান মুহাদ্দিছ, তেমনি জিহাদের ময়দানেও বীরযোদ্ধা ছিলেন। দানশীলতা, তাক্বওয়া, পরহেযগারিতা ও দুনিয়াবিমুখতায় তার জুড়ি পাওয়া ভার। তিনি এক বছর হজ্জের জন্য বের হতেন আরেক বছর জিহাদের জন্য বের হতেন। এভাবেই ইবাদত, ইলমের খেদমত ও জিহাদের মাধ্যমে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, (২) আবূ হুরায়রা, (৩) আবূ ক্বাতাদা আল-আনছারী, (৪) মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান, (৫) যুবাইদ ইবনুছ ছালত, (৬) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ, (৭) আব্দুল্লাহ ইবনু কারেয রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) উমার ইবনু আব্দুল আযীয, (২) উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী ইয়াযীদ, (৩) ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর, (৪) আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, (৫) আবূ আহমাদের ছেলের মনিব আবূ সুফিয়ান রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر অর্থাৎ 'আমি যদি

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ৫/১১৩; তারীখুল ইসলাম, ৫/৬০৫।

বছরে তিন দিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো হওয়ার চেষ্টা করি, তবুও সক্ষম হব না'। এই মহান মনীষী ১৮১ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[২]

(৩) ইউনুস :

তার পূর্ণ নাম ইউনুস ইবনু যুবায়ের আল-বাহেলী রাহিমাহুল্লাহ। উপনাম আবূ গেলাব। তার নিসবত বাছরী, বাহেলী ও আয়লী। ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ-এর ছাত্রদের মধ্যে যারা সবচেয়ে মযবূত ও গ্রহণযোগ্য তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ আল-আয়লী রাহিমাহুল্লাহ।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) বারা ইবনু আযেব, (২) কাছীর ইবনুছ ছালত, (৩) মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, (৪) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, (৫) জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ছাত্রবৃন্দ : (১) হুমাইদ ইবনু হেলাল আল-আদাবী, (২) আব্দুল্লাহ ইবনু আউন, (৩) ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা, (৪) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুমুল্লাহ। তিনি ৯০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

(৪) বিশর ইবনু মুহাম্মাদ :

তার পূর্ণ নাম বিশর ইবনু মুহাম্মাদ আস-সিখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। কুতুবে সিত্তাহর কেউই তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেননি। শুধু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার উপর মুরজিয়া হওয়ার বক্তব্য আছে। ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেহেতু তিনি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষকগণের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তার হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-ই বেশি অবগত ছিলেন।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, (২) ফাযল ইবনু মূসা আস-সিনানী, (৩) ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াযিহ রাহিমাহুমুল্লাহ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) ইমাম বুখারী, (২) আহমাদ ইবনু সায়য়ার আল-মারওয়াযী, (৩) জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-ফিরয়াবী রাহিমাহুমুল্লাহ। তিনি ২২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

(৫) মা'মার :

মা'মার ইবনু রাশেদ রাহিমাহুল্লাহ। তার পূর্ণ নাম মা'মার ইবনু রাশেদ আল-আযদী রাহিমাহুল্লাহ। উপনাম আবূ উরওয়া আল-বাছরী। তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তার অন্যতম ছাত্র মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকের লেখক আব্দুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম আছ-ছানআনী তার থেকে প্রায় ১০ হাজার হাদীছ শ্রবণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি একজন মযবূত ও গ্রহণযোগ্য ইমাম ছিলেন। তবে যখন তিনি নিজ শহর ইয়ামানের বাহিরে সফর করা অবস্থায় বিশেষ করে ইরাকের বাছরা নগরীতে হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তার নিকটে তার লিখিত পাণ্ডুলিপি না থাকায় কিছু বর্ণনায় সমস্যা হয়। তেমনিভাবে তিনি যখন ছাবিত আ'মাশ ও হিশাম থেকে কোনো হাদীছ বর্ণনা করেন, তখনও কিছু ত্রুটি হয়ে যায়। তার লিখিত অন্যতম হাদীছগ্রন্থ জামে' মা'মার ইবনু রাশেদ বর্তমানে প্রকাশিত আকারে পাওয়া যায়।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) ইবরাহীম ইবনু মায়সারা, (২) যিয়াদ ইবনু ইলাকা, (৩) ছালেহ ইবনু কায়সান, (৪) আব্দুল্লাহ ইবনু তাঊস, (৫) আতা আল-খুরাসানী, (৬) আমর ইবনু দীনার আল-মাক্কী, (৭) মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির, (৮) হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাহুমুল্লাহ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, (২) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, (৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, (৪) আমর ইবনু দীনার, (৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-ওয়াক্বীদী, (৬) মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর আছ-ছানআনী, (৭) মারওয়ান ইবনু মুআবিয়া আল-ফাযারী, (৮) ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর রাহিমাহুমুল্লাহ। এই মহান মুহাদ্দিছ ১৫৪ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।[৫]

(৬) উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ :

তার পূর্ণ নাম উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসঊদ রাহিমাহুল্লাহ। কুনিয়াত বা উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। নিসবত আল-হুযালী ও মাদানী। তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষক ছিলেন। মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফক্বীহর একজন ছিলেন তিনি, যারা ছাহাবীগণের জীবদ্দশাতেই ফতওয়া দিতেন। কুতুবে সিত্তাহর সকলেই তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, (২) আব্দুল্লাহ ইবনু যামআ, (৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, (৪) উরওয়া ইবনু যুবায়ের, (৫) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, (৬) উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, (৭) আম্মার ইবনু ইয়াসার, (৮) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ছাত্রবৃন্দ : (১) ছালেহ ইবনু কায়সান, (২) সা'দ ইবনু ইবরাহীম, (৩) মূসা ইবনু আবী আয়েশা, (৪) ইরাক ইবনু

২. আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ৫/১৭৯; তারীখুল ইসলাম, ৪/৮৮২।

৩. তারীখুল ইসলাম, ৪/২৫৭।

৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৩১।

৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৫।

মালেক, (৫) সাঈদ ইবনু আবী হিন্দ, (৬) সালেম আবূ নাযর রাহিমাহুমুল্লাহ। এই মহান ইমাম ৯৪ হিজরী মতান্তরে ৯৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৬]

সনদের সূক্ষ্মতা :

উক্ত হাদীছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে নিয়ে ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত দুটি আলাদা সনদ উল্লেখ করেছেন। এই দুটি আলাদা সনদ উল্লেখ করতে গিয়ে উছূলে হাদীছের দুটি পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন।

প্রথমত, আরবী বর্ণ (ح) চিহ্নের মাধ্যমে সনদের মধ্যে পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। **দ্বিতীয়ত,** উভয় সনদের ইবারতের মধ্যে কতটুকু মিল রয়েছে তা বুঝাতে আরবী শব্দ 'নাহওয়াহু' (نحوه) ব্যবহার করেছেন। নিম্নে এই দুটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মিছলাহু (مثله) ও নাহওয়াহু (نحوه)-এর মধ্যে পার্থক্য :

সাধারণত হাদীছের কয়েকটি সনদ হলে সনদের সাথে সাথে মতন বা মূল টেক্সটেও কিছু নতুনত্ব থাকে। সনদের পরিবর্তনের সাথে সাথে মতনের এই পরিবর্তন কতটুকু তা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিছগণ সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। একটি মিছলাহু (مثله) এবং অন্যটি নাহওয়াহু (نحوه)। যদি বলা হয় মিছলাহু, তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে শব্দে শব্দে হুবহু মিল রয়েছে। আর যদি বলা হয় নাহওয়াহু, তাহলে বুঝতে হবে শব্দে হালকা পার্থক্য থাকলেও ভাবার্থ এক।[৭]

তাহবীল কী ও কেন?

এক সনদ থেকে আরেক সনদের দিকে যাওয়ার জন্য মধ্যখানে (ح) হা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যার দ্বারা তাহবীল (تحويل) উদ্দেশ্য। মূল মাদ্দাহ ح-و-ل থেকে বাবে তাফঈল-এর মাছদার হচ্ছে তাহবীল (تحويل)। যার শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন। তাহবীলের পরিবর্তে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হা (ح) ব্যবহার করা হয়। হাদীছ পড়ার সময় উক্ত হা (ح)-এর জায়গায় তাহবীল পুরোটাই উচ্চারণ করা যায় অথবা শুধু (حاء) হাউন তানবীনসহ পুরো বর্ণ উচ্চারণ করা যায়। তবে বর্তমানে হাদীছ পড়ার সময় যেটা প্রচলিত আছে তা হচ্ছে শুধু হা (ح) উচ্চারণ করা। শুধু হা (ح) উচ্চারণ শুনলেই ছাত্ররা বুঝে ফেলে যে, এখানে সনদ পরিবর্তন হচ্ছে। তবে হা (ح) উচ্চারণের পরপরই সবসময় একটা শব্দ অতিরিক্ত করা উচিত আর তা হচ্ছে 'ওয়া বিহি কলা' (وبه قال)। তথা একত্রে হা (ح وبه قال حدثنا) 'ওয়া বিহি কলা হাদ্দাছানা'। এখানে ওয়া বিহি দ্বারা আমরা যে সনদে মূল লেখক তথা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই সনদ উদ্দেশ্য। আর 'কলা' (قال) দ্বারা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ হা (ح) দ্বারা হায়েল (حائل) উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যার অর্থ হচ্ছে দুটি বিষয়ের মাঝে আড় সৃষ্টি করা। তথা এখানে দুটি সনদ যেন একত্রিত না হয়ে যায় এই জন্য হা (ح) দেওয়া হয়েছে। যারা হা (ح) দ্বারা হায়েল উদ্দেশ্য নিয়েছেন তারা হাদীছ পড়ার সময় এখানে কোনো কিছু উচ্চারণের কথা বলেননি। বরং তাদের মতে এখানে চুপ থাকতে হবে।

পশ্চিম বা স্পেনের উলামায়ে কেরাম হা (ح) দ্বারা হাদীছ উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন এবং হা-এর জায়গায় সবসময় হাদীছ পড়ে থাকেন তারা।

কেউ কেউ এখানে হা-এর পরিবর্তে (صح) 'ছহ' ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হচ্ছে সঠিক। তথা কেউ যেন মনে না করে যে এখানে কোনো সমস্যা আছে বা কোনো রাবী বা শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে, বরং যেভাবে আছে সেভাবেই বিশুদ্ধ আছে।[৮]

হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক :

আলোচ্য হাদীছটির স্বাভাবিক অর্থ দেখলে সবাই মনে করবে এই হাদীছ রামাযানের ফযীলতের হাদীছ। কিন্তু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীছকে অহির প্রারম্ভ অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অথচ এই হাদীছে অহির প্রারম্ভ নিয়ে কিছুই বলা নাই। সুতরাং এই হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সামঞ্জস্য জানা অতীব জরুরী।

ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে মর্মে সরাসরি কোনো বক্তব্য ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর ছহীহ হওয়ার শর্ত অনুযায়ী না পাওয়ার কারণে তিনি এমন একটি হাদীছ খুঁজেছেন, যার দ্বারা তিনি পবিত্র কুরআনের রামাযান মাসে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণ করবেন। আর সেই লক্ষ্যেই তিনি এই হাদীছকে এখানে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছে রামাযান মাসের প্রতি রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর আসা এবং পবিত্র কুরআন শুনিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে পবিত্র রামাযান মাসের সাথে পবিত্র কুরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাসের সাথে পবিত্র কুরআনের গভীর সম্পর্কটিই হচ্ছে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রামাযান মাসে। প্রথম অহিও এসেছে রামাযান মাসে। সুতরাং হাদীছের সাথে অহির সূচনা বা অধ্যায়ের নামের কোনো বৈপরীত্য নাই।[৯]

(চলবে)

৬. তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৫।
৭. ইরশাদুস সারী, ১/৭১।
৮. উমদাতুল ক্বারী, ১/৮; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃ. ৮৮।
৯. ফাতহুল বারী, ১/৮।

ইসলামে শূকরের গোশত হারাম কেন

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দিন**

দ্বীন ইসলাম অহীয়ে মাতলূ কুরআন ও অহীয়ে গায়রে মাতলূ ছহীহ হাদীছনির্ভর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামী শরীআতও শতভাগ কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের আলোকে সালাফদের অনুসরণে নির্ধারিত। ইসলামী শরীআতের বিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হালাল-হারাম সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। আল্লাহর কালাম কুরআন এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ছহীহ হাদীছ দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য যে সকল খাদ্য হারাম করা হয়েছে, তার মধ্যে শূকর অন্যতম।

মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামে রয়েছে সুশৃঙ্খল নিয়মকানুন, রয়েছে নানা ধরনের বিধিনিষেধ। আর বিধিনিষেধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইসলামের বিধি মোতাবেক শূকরের গোশত মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ হারাম করেছেন, বিধায় ঈমানদার কোনো মুসলিম শূকরের গোশত খেতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ মুসলিমদের জন্য যা কিছু খারাপ, ক্ষতিকর, বিপজ্জনক তাই হারাম ঘোষণা করেছেন আর যা কিছু ভালো, উপকারী তার প্রায় সবগুলোই মুসলিমদের জন্য হালাল।

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত এবং তাঁর পক্ষ থেকে সহজায়ন হচ্ছে তিনি আমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ খাওয়া বৈধ করেছেন এবং শুধু অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেছেন।

ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকই শূকরের গোশত খায়। কিন্তু মুসলিমদের কাছে শূকরের গোশতকে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা হারাম করা হয়েছে বলে কোনো মুসলিম শূকরের গোশত খায় না। মুসলিমরা শূকরের গোশত খায় না বলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই এটা নিয়ে মুসলিমদের সমালোচনা করেন। কিন্তু শূকরের গোশত কেন ইসলামে হারাম করা হয়েছে সেই রহস্য জানলে শুধু মুসলিমগণই নয় বরং বিধর্মীরাও বলবে শূকরের গোশত নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আসুন! আলোচ্য প্রবন্ধে জেনে নিই ইসলামে কেন শূকরের গোশত নিষিদ্ধ।

কুরআনে নিষিদ্ধতা :

শূকরের গোশত খাওয়া নিষেধ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ চার স্থানে শূকরের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং বিভিন্ন রোগের কারণ। কুরআনের যে চার জায়গায় নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো হলো, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত জীবজন্তুর গোশত, প্রবাহমান রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেইসব জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। তবে কেউ নিরুপায় হয়ে নাফরমানী কিংবা সীমালঙ্ঘন না করে গ্রহণ করলে,, তার উপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৩)*। আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরও বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, প্রবাহমান রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত আর হিংস্র জন্তুর খাওয়া পশু। তবে জীবিত পেয়ে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা বাদে। আর যা কোনো মূর্তির বেদিতে যবেহ করা হয়েছে। আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা (এগুলো তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে)। এ সবগুলো পাপ কাজ। আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম। তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় তা গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'বলো! আমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে তাতে মানুষ যা আহার করে তার কিছুই নিষিদ্ধ পাই না; মৃত, প্রবাহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ছাড়া। কারণ তা অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা ফাসেক্বী কাজ। তবে কেউ

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিরুপায় হয়ে নাফরমানী কিংবা সীমালঙ্ঘন না করে গ্রহণ করলে, তাহলে তোমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আনআম, ৬/১৪৫)*।

আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে। তবে কেউ নিরুপায় হয়ে নাফরমানী কিংবা সীমালঙ্ঘন না করে গ্রহণ করলে, আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু' *(আন-নাহল, ১৬/১১৫)*।

ইসলামে শূকরের গোশত কেন নিষেধ করা হয়েছে তার সন্তোষজনক উত্তরের জন্য কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহই যথেষ্ট।

বাইবেলে নিষিদ্ধতা :

পবিত্র কুরআন ছাড়া বাইবেলেও শূকরের গোশত নিষেধ করা হয়েছে। বাইবেল লেভীটিকাস্থ গ্রন্থে শূকরের গোশত খেতে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে, আর শূকর যদিও তার ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত এবং ক্ষুরযুক্ত পদবিশিষ্ট। এমনকি সে চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না। (তবু) ওটা অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র) তোমার জন্য'। একই গ্রন্থের ১১ অধ্যায় ৭ ও ৮ স্তবকে বলা হয়েছে, ওগুলোর গোশত তুমি খাবে না এবং ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শও করবে না, ওগুলো অপবিত্র তোমার জন্য।

বাইবেলের পঞ্চম গ্রন্থ ডিউট্যারনমী (Deuteronomy)-তেও শূকরের গোশতকে 'অপবিত্র' বলা হয়েছে, আর শূকর কারণ তার ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত, এমনকি চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, ওটা অপবিত্র তোমার জন্য তুমি ওগুলোর গোশত খাবে না, না ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে।[১]

শূকরের গোশত ভয়ংকর রোগের কারণ :

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যতীত বিজ্ঞানের মাধ্যমেও আজ প্রমাণিত যে, শূকরের গোশত মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মানবদেহের উপর শূকর খাওয়ার বিভিন্ন অপকারিতার প্রমাণ পেয়েছে। অন্যান্য অমুসলিম ও নাস্তিকরা হয়তো উপযুক্ত কারণ ও বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমাণে মেনে নিতে পারে। শূকরের গোশত ভক্ষণ কমপক্ষে ৭০টি রোগের উদ্ভব ঘটাতে পারে। আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন প্রকার কৃমির দ্বারা। যেমন বৃত্তাকার কৃমি, ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত কৃমি এবং বক্র কৃমি। শূকরের গোশত খাওয়া চর্মরোগ ও পাকস্থলির ছিদ্র ইত্যাদি রোগের কারণ। শূকরের গোশত খাওয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, শূকরের গোশতে ফিতা কৃমির শুক্রকীট থাকে; যাকে বলা হয় টিনিয়া সলিয়াম (Taenia Solium)। সাধারণভাবে যেটাকে ফিতা কৃমি বলা হয়। এটা পেটের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং অনেক লম্বা হয়। এ কৃমি ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এ কৃমির ডিমগুলো যদি মস্তিষ্কে বৃদ্ধি পায় তাহলে পরবর্তীতে মানুষ পাগলামি ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর যদি হার্টে বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হতে পারে। শূকরের গোশতের মধ্যে আরো যেসব কৃমি থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে ট্রিচিনিয়াসিস কৃমির শুক্রকীট যা রান্না করলেও মরে না। মানুষের শরীরে এ কৃমি বাড়ার ফলে মানুষ প্যারালাইসিস ও চামড়ায় ফুসকুড়িতে আক্রান্ত হতে পারে। এর ডিম রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং দেহের প্রায় সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে, যদি এটা মস্তিস্কে ঢোকে, তাহলে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে। হৃদযন্ত্রের মধ্যে ঢুকলে বন্ধ করে দিতে পারে হৃদযন্ত্রক্রিয়া। চোখে ঢুকলে অন্ধত্বের কারণ হয়, কলিজায় ঢুকলে সেখানে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে অর্থাৎ এটা শরীরের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপরও আছে আরও ভয়ংকর 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস্থ'। এটা ভালো করে রান্না করলেও এর ডিম মারা যায় না। এর ওপরে আমেরিকায় গবেষণা চালানো হয়েছে। ফলাফলে এসেছে ভালো করে রান্না করার পরও প্রতি ২৪ জনের ২২ জন এই 'ত্রীচুরাসীস্থ' দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া মানুষের এমন কিছু রোগ আছে যে রোগগুলো প্রাণীদের মধ্যে শুধু শূকরের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। যেমন- বাতরোগ (Rheumatology) ও জয়েন্টের ব্যথা।[২]

শূকরে রয়েছে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর :

বিভিন্ন প্রাণীর গোশতের মধ্যে শূকরের গোশতে সবচেয়ে বেশি চর্বিযুক্ত কোলেস্টেরল রয়েছে। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তনালি ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া শূকরের গোশতে থাকা 'ফ্যাটি এসিড' অন্য সকল খাদ্যে থাকা ফ্যাটি এসিড থেকে ভিন্নরকম ও ভিন্ন গঠনের। তাই অন্য যেকোনো খাদ্যের তুলনায় মানুষের শরীর খুব সহজে একে চুষে নেয়। যার ফলে রক্তে কোলেস্টেরল এর পরিমাণ বেড়ে যায়।[৩]

শূকরের গোশত ও চর্বি মেদ বাড়ায় এবং মেদসংক্রান্ত রোগ বাড়ায়; যেগুলোর চিকিৎসা করা অনেক দুরূহ। শূকরের গোশত ও চর্বি কোলন ক্যান্সার (বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার), রেক্টাল ক্যান্সার

---

১. ডিউট্যারনমী, ১৪:৮।

২. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, অধ্যায় : ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব, প্রশ্ন- ১১ (৩), পৃ. ৩৪৬ এবং প্রশ্ন- ৩৩ (খ), পৃ. ৪১৬।

৩. প্রাগুক্ত, প্রশ্ন- ১১ (৪), পৃ. ৩৪৬ এবং প্রশ্ন- ৩৩ (খ), পৃ. ৪১৬।

(মলদ্বারের ক্যান্সার), অণ্ডকোষের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার এর বিস্তার ঘটায়।

শূকরের গোশতে পেশী তৈরির উপাদান অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে থাকে। পক্ষান্তরে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর। এ জাতীয় চর্বি বেশিরভাগ রক্তনালিতে জমা হয়, যা কারণ ঘটায় হাইপার টেনশন এবং হার্ট অ্যাটাকের। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনের রোগী।[৪]

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে শূকরের চর্বি মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই বর্তমানে ইউরোপীয় অনেক উন্নত দেশ শূকরের গোশত থেকে চর্বি আলাদা করে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রপ্তানি করছে! আমাদের দেশের খবরেও প্রকাশিত হয়েছে এবং পরীক্ষায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের অনেক নামিদামি আইসক্রিম কোম্পানি এবং অনেক ডেইরি মিল্ক কোম্পানির চকোলেট তৈরিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে সস্তায় আমদানি করা শূকরের চর্বি।[৫] আর আমাদের সন্তানেরা না জেনেই এ মারাত্মক ও হারাম মুখরোচক মজাদার খাবার হিসাবে দেদারসে খাচ্ছে, না জেনে অবাধ্যতার মধ্যে নিপতিত হচ্ছে আর ঝুঁকিপূর্ণ করছে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন! যেটি মারাত্মক বিভীষিকাময় হতে পারে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকার এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে যথাযথ আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শূকর নোংরা ও পঙ্কিলতম প্রাণী :

এই নোংরা প্রাণীটি বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও ময়লাপূর্ণ জায়গায়। আল্লাহ তাআলা সমাজবদ্ধ সৃষ্টিকুলের মেথর বা ময়লা পরিষ্কারক হিসাবেই বোধ করি এ প্রাণীটি সৃষ্টি করেছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগেও যখন স্যানিটারি ল্যাট্রিন আবিষ্কৃত হয়নি তখন যে কোনো শহরের পায়খানার ধরন ছিল উন্মুক্ত। লোকেরা উন্মুক্ত স্থানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করত আর মেথর এসে তা ট্যাঙ্কি ভরে নিয়ে যেত এবং শহরের উপকণ্ঠে কোথাও ফেলত। যা ছিল শূকরদলের পরম আনন্দ নিবাস। শূকর গোবর, পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনার উপর জীবন-যাপন করে এবং মহান আল্লাহ শূকরকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট জিনিসভোক্তা ও ময়লা-আবর্জনার উপর লালিত-পালিত প্রাণী বানিয়েছেন বলে শূকররা এ ধরনের ময়লা খতম করে।[৬] অনেকেই হয়তো এখন বিতর্কে নেমে পড়বেন উন্নত বিশ্বে এখন শূকরের পরিচ্ছন্ন খামার করা হয়েছে যেখানে ওগুলো লালিতপালিত হয়। তাদের এই অনেক উন্নত, স্বাস্থ্যকর খামারেও ওগুলো নোংরা জীবনযাপন করে। অত্যন্ত আনন্দের সাথেই তারা তাদের নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা নিয়ে তাদের চোখ, নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে আর উৎসবের খাদ্য হিসেবেই খায়।

শূকর নির্লজ্জ পশু :

ভূপৃষ্ঠের উপরে শূকর অশ্লীলতায় নির্লজ্জতম প্রাণী। শূকরই একমাত্র পশু যে তার স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে সঙ্গম করার জন্য অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদের ডেকে আনে।[৭] ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য শূকরের গোশত। খাদ্যাভ্যাস আচরণে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা তারাই। ওদের প্রিয় হলো নেচে-গেয়ে পার্টি জমানো আর উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে তখন একে অপরের সাথে বউ বদল করা। অনেকেই আবার জীবন্ত নীল জগতের স্বাদ নিতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে বন্ধুবান্ধব ডেকে নেয়। এসব প্রমাণ করে, শূকরের গোশত মানুষকে নির্লজ্জতার দিকে ধাবিত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআনে শূকর হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে এটি 'রিজস' বা অপবিত্র। মানুষের সুস্থ বিবেক ও শরীআত কর্তৃক নিন্দনীয় যেকোনো জিনিসকে আরবীতে 'রিজস' বলা হয়। শূকরের গোশত হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে এটিই যথেষ্ট। এছাড়াও খাদ্য-পানীয় বস্তু হালাল বা হারাম হওয়ার জন্য যে সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে তার আলোকেও শূকরের গোশত হারামের আওতায় পড়ে।

সূরা আল-আ'রাফের ১৫৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য উত্তম জিনিস হালাল করেছেন আর খাবাইছ (নিকৃষ্ট জিনিস) হারাম করেছেন'। এখানে 'খাবাইছ' দ্বারা ওই সমস্ত জিনিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা মানুষের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক বা আর্থিক ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং যে জিনিসই মানুষের জন্য কোনো ক্ষতিকর ফল বয়ে আনে তাই খাবাইছ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

শূকরের গোশত ভক্ষণের ফলে মানুষ যেমন ইহকালীন রোগবালাই আর কষ্ট ভোগ করবে, তেমনি পরকালে ভোগ করবে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাই আমাদের কোনোভাবেই আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো কাজ করা উচিত নয়। তাহলেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় শান্তির হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে শূকর নামক এ নিকৃষ্ট প্রাণীর সকল অপকারিতা থেকে রক্ষা করুন আর আমরা যেন সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারি সে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪. প্রাগুক্ত।

৫. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২১ মার্চ ২০২২, প্রবন্ধ শিরোনাম : শূকরের চর্বিজাত খাবার ও প্রসাধনী নিয়ে সতর্কতা।

৬. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, অধ্যায় : ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব, প্রশ্ন- ৩৩ (খ), পৃ. ৪১৬।

৭. প্রাগুক্ত, প্রশ্ন- ১১ (৪), পৃ. ৩৪৬ এবং প্রশ্ন- ৩৩ (খ), পৃ. ৪১৬।

ইছলাহ হোক আল্লাহর জন্যে

*-আকরাম হোসেন**

‘ইছলাহ’ (إِصْلَاح) শব্দটি আরবী। অর্থ: শুদ্ধি, সংশোধন, মেরামত, ঠিককরণ, শান্তি-স্থাপন, উন্নতিসাধন ইত্যাদি।[১] যা সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থার উন্নতিকরণ, শুদ্ধিকরণ, মীমাংসা, বিশেষত সংস্কার বা সংশোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রায়াস পাব।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে একত্রিত হয়ে সমাজে বসবাস ও মেলামেশা করতে হয়। জীবনের প্রয়োজনে এই মেলামেশায়, চলাফেরায়, কথাবার্তায় দুনিয়াবী ও শারঈ বিষয়ে প্রায়ই মানুষই কম-বেশি ভুলত্রুটি করে থাকে। আর উত্তম সে ব্যক্তি, যে এই ভুলের সংশোধন করে দেয় এবং যে ভুলকারী তা সংশোধন করে নেয়। শারঈ বিষয়ে ভুল সংশোধনকারী (তওবাকারী) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা তওবা করে’।[২]

তবে ভুল ধরতে বা সংশোধন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা, তাকে হেয়, অপমান, অপদস্থ বা লাঞ্ছিত করা যাবে না। রূঢ়, কর্কশ ও কঠিন ভাষাও ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং ইছলাহ (সংশোধন) করতে হবে হিকমতের সহিত, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার চেতনায়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ‘নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ’ *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*।

সমাজে অনেক এমন লোক বাস করে, যারা কথায় কথায় মানুষের ভুল ধরে থাকে, অবশ্য এটা স্বভাবও বটে। এদেরকে বলা হয় পরচ্ছিদ্রান্বেষী। পরের ভুল ধরে এরা বেশ মজা পেয়ে থাকে। আবার এ ভুল তারা লোকালয়ে প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে। যদিও সে আনন্দ কখনই নির্মল অথবা মার্জিত নয়। দোষে-গুণে মানুষ। কথায় আছে- মানুষ মাত্রই ভুল করে। এটা ঠিক নয় যে, সব সময় অন্যের ভুল ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। এতে সৎগুণের পরিচয় মিলে না। হ্যাঁ, অন্যের ভুল ধরা যেতে পারে যদি তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়। একজন মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকের উচিত হবে অপরের সাহায্য করা, তার সুখ-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ানো, ভুল করলে সংশোধন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ‘আর সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ‘নিশ্চয় প্রতিটি কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল’।[৩] আল্লাহ সকলের অন্তরের খবর জানেন। আল্লাহ জানেন, আসলে সে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ভুল ধরে, না অপদস্থ বা অপমান করার উদ্দেশ্যে ভুল ধরে। মহান আল্লাহ সূরা হূদের ৮৮ নং আয়াতে শু‘আইব আলাইহিস সালাম -কে তাঁর সম্পর্কে তাঁর বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি জাতিকে যখন ইসলাম ও ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেলেন- তখন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার, তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকার, তাদের যে ভুলত্রুটি ছিল সেগুলোকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতিকে বলেছিলেন, ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ ‘আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধ্যমতো শুধু ইছলাহ তথা সংশোধন করা’ *(হূদ, ১১/৮৮)*।

অবশ্যই আমাদের এই সংশোধনের উদ্দেশ্য যেন না হয় কারো উপর আক্রমণ করে বা ক্ষতি করে, কারো প্রতি

---

* বি.এ (অনার্স), এম.এ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, (২১তম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৬), পৃ. ১০৯।

২. তিরমিযী, হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫১; মিশকাত, হা/২৩৪১, হাদীছ হাসান।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭; মিশকাত, হা/১।

হিংসা, রাগ, অসম্মান, অভক্তি প্রকাশ বা প্রদর্শন করে। যদি ভুলত্রুটি ধরা হয়, তবে তা হতে হবে আন্তরিকতার সহিত সুন্দর ভাষার মাধ্যমে- শুধু দ্বীনের স্বার্থে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কারো ভুল ধরা আমাদের কর্তব্য। শারঈ বিষয়ে ভুলকারীর ক্ষেত্রে এটি শুধু তার ব্যক্তি জীবনের ক্ষতি নয়, হয়তোবা তিনি তার বক্তব্যে বা লিখনীতে এমন কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো শুনে বা পড়ে মানুষ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে, ভুল পথে পরিচালিত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরতে পারে, সেই জন্য মানবজাতিকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরা তখন অত্যাবশ্যক হয়ে যায়।

তবে কথায় কথায় ব্যক্তিজীবন এবং বাহ্যিক বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভুলত্রুটি ধরা ঠিক নয়। যেমন: পার্থিব কথাবার্তায়, চালচলনে, ওঠা-বসায়, আচার-আচরণে ইত্যাদির ক্ষেত্রে। নিতান্ত প্রয়োজনে এই ধরনের ভুল ধরিয়ে দিতে চাইলে তা অন্য দশ জনের সামনে বলা উচিত হবে না। এসব ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা হয়তো সে এতে মনঃকষ্ট বা লজ্জা পাবে, অপমানিত হবে। আর এমনিভাবে তাকে অপমান করার অর্থ- ইচ্ছা করেই তার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[৪] ফুযাইল রাহিমাহুল্লা-হ বলেন, 'ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখে ও একান্তে উপদেশ দেয়। আর পাপী লোক মানুষকে অসম্মান করে, ভর্ৎসনা করে ও প্রকাশ্যে লজ্জা দেয়'।[৫]

এছাড়া অন্যের ভুল ধরা যদি আপনার নিত্য আচরণ হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা হবে আপনার একটি মন্দ স্বভাব। এ জন্য নিশ্চয় আপনি অন্যের বিরাগভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। অন্যেরা কখনই আপনাকে ভালো চোখে দেখবে না। আপনার সঙ্গ কামনা করবে না। বরং আপনার সাহচর্য থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। আপনাকে অসৎ, ক্ষতিকারক ও কুস্বভাবের ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করবে।

অবশ্য বেশি ভুল ধরার পেছনে কারো কারো এ মনোবৃত্তি কাজ করে থাকে, তা হচ্ছে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা, অন্যের ভুল ধরে নিজেকে একজন বাহাদুর মনে করা, নিজেকে অধিক জ্ঞানী হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করা। কিন্তু এ ধরনের ধারণা কখনই সত্য হয় না। অন্যকে ছোট করে দেখা কখনই বাহাদুরি হতে পারে না। অন্যকে মূর্খ প্রমাণ করা কখনই জ্ঞানের পরিচয় নয়। বরং তার উল্টোটাই; অর্থাৎ মূর্খরাই অন্যকে মূর্খ ভাবে, আর জ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই নিজেদেরকে জ্ঞানী ভাবে। এ ধরনের ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ ও দেশ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া পরচ্ছিদ্রান্বেষী একটি 'খুঁত' বিশেষ। এদেরকে কেউ পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলার সতর্কবাণী, ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ 'ধ্বংস প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে' *(আল-হুমাযাহ, ১০৪/১)*।

পরিশেষে বলতে চাই, একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক ও সচেতনভাবে চলার চেষ্টা করতে হবে, শালীনতা বজায় রেখে কথাবার্তা বলতে হবে, সর্বোপরি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দেখানো পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা করতে হবে। তবেই সফলতা লাভ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু (লজ্জাস্থান) হেফাযতের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[৬]

এছাড়া আমরা সবাই একে অপরের দ্বীনি ভাই।[৭] আমাদের উচিত সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে একসাথে মিলেমিশে বাস করা। অসৎ উদ্দেশ্যে কারো ভুল ধরা থেকে বিরত থাকা এবং কোনো ব্যক্তি ভুল করলে বা ভুল বললে তাকে নম্রভাবে ও বিনয়ের সাথে বলে সংশোধন করা। কেননা 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে নিজেদের ভুল হলে সংশোধন হওয়ার এবং কেউ ভুল করলে হিকমতের সহিত উত্তম উপায়ে সংশোধন করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

---

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১; মিশকাত, হা/৬।
৫. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ২০৪, হা/৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪; মিশকাত, হা/৪৮১২।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪২; মিশকাত, হা/৪৯৫৮।

‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ নিয়ে বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা

-মো. হাসিম আলী*

রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কোনো নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইনের মাধ্যমে সংগঠিত জনসমূহকে রাষ্ট্র বলে। অন্যদিকে ধর্ম মানবজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি নৈতিক ভিত্তি বিধায়ক। ধর্ম মানুষের জীবনে শান্তি, সৌহার্দ-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক শক্তি। এটি জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নিরাপত্তা বিধান করে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আবহমানকাল থেকেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও গুরুত্ব মানুষের চিরন্তন বৈশ্বিক চেতনায় পরিণত হয়, যা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগেও সমভাবে বিদ্যমান। সে কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানুষ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলা যায়, ধর্ম মানুষের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে।

‘ধর্ম’ শব্দটি বাংলা অভিধানে সৎকর্ম, নিয়মতান্ত্রিক আচার, রীতি-নীতি, স্রষ্টা, পরকাল এবং অলৌকিক বিশ্বাস ও উপাসনাপ্রণালির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। সংস্কৃত ভাষায় ধৃ’ সঙ্গে মন প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর ধাতুগত অর্থ হলো, যা ধারণ করে তাই ধর্ম। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Religion, যা Religere শব্দ থেকে নির্গত। ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী Religion শব্দটির অর্থ হলো Bond বা বন্ধন, যা দৃঢ়ভাবে কোনোকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আরবী অভিধানে ধর্মের প্রতিশব্দ হলো দ্বীন (دِيْن)। এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা প্রতিদান, শরীআত বা ব্যবহারিক নিয়ম-পদ্ধতি, আনুগত্য, বিচার বা ফয়সালা, অনুসরণ, আত্মসমর্পণ, আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, আইনকানুন, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, কর্তৃত্ব, মতাদর্শ, মতবাদ, মনোনীত জীবনবিধান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, ধর্ম বা দ্বীন হলো আল্লাহ প্রবর্তিত এমন এক জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষকে তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী হিসেবে গড়ে তোলে এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট ধর্মের অধিক পরিচিত সংজ্ঞাটি হলো— ‘ধর্ম হলো আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করার নাম’। অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, ধর্ম হলো মানুষের এমন কোনো উচ্চতর শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া বা তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোটকথা, ধর্ম হলো মানব ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী একটি পবিত্র মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানবতা বিকশিত হয় এবং কর্মাচরণ সুশৃঙ্খল হয়। সুতরাং রাষ্ট্রধর্ম বলতে বুঝায়— কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে সাংবিধানিকভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধজীবন তার একান্ত কাম্য। সমাজ ছাড়া সে বসবাস করতে পারে না। আর ধর্ম হলো মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই মনুষ্য সমাজ কাঠামো ও সামাজিক কাঠামো ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানুষের সাথে ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক এমন অবিচ্ছেদ্য যে কখনো একটি থেকে অপরটি আলাদা করা যায় না। সে কারণে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতাতেই ধর্মের অবস্থান ছিল অতি উচ্চতায়। ধর্ম ছাড়া আজও কোনো জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের সংখ্যা প্রায় ৪৩০০টি। তন্মধ্যে প্রধান ধর্ম ১০টি। যথা : ইসলাম, খ্রিষ্ট, হিন্দু, বৌদ্ধ, হানজু বা হান, শিখ, ইয়াহূদী, বাহাই, জৈন, শিন্তো। সবচেয়ে বেশি অনুসারী হলো খ্রিষ্টধর্মের। তাদের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২৪০ কোটি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো ইসলাম। এর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটি। তবে এটি পৃথিবীর দ্রুত প্রসারমান ধর্ম। সাম্প্রতিক অনেক গবেষণায় বলা হচ্ছে, খ্রিষ্ট অধ্যুষিত ইউরোপ অর্ধশতাব্দীকাল পর মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

প্রতিটি দেশেই, প্রতিটি জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো ধর্ম পালিত হয়ে থাকে। ধর্মহীন জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব কল্পনা করা কঠিন। পৃথিবীতে মোট ২২৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬০টি রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্ম হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৮টির রাষ্ট্রধর্ম খ্রিষ্টানিটি, ২৬টির রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ৫টির বৌদ্ধ এবং ১টির ইয়াহূদীধর্ম। এসব দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর বোধ-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাদের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আছে এমন দেশগুলো হলো : ১. বাংলাদেশ, ২. জিবুতি, ৩. ইরাক, ৪. পাকিস্তান, ৫. ফিলিস্তীন, ৬. তিউনিসিয়া, ৭. আফগানিস্তান, ৮. আলজেরিয়া, ৯. ব্রুনাই, ১০. কোমোরোস, ১১.জর্দান, ১২. লিবিয়া, ১৩. মালদ্বীপ, ১৪. মালয়েশিয়া, ১৫. মৌরতানিয়া, ১৬. মরক্কো, ১৭. মিশর, ১৮. কাতার, ১৯. সঊদী আরব, ২০. সোমালিয়া, ২১. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ২২. ইরান, ২৩. ওমান, ২৪. কুয়েত, ২৫. ইয়ামান ও ২৬. বাহরাইন।

রাষ্ট্রধর্ম খ্রিষ্টান আছে এমন দেশ হলো : ১. কোস্টারিকা, ২. নিশটেনস্টাইন, ৩. মাল্টা, ৪. মোনাকো, ৫. ভ্যাটিকান, ৬.

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

অ্যানডোরা, ৭. আর্জেন্টিনা, ৮. ডোমিনিকান রিপাবলিক, ৯. এল সালভাদর, ১০. পানামা, ১১. প্যারাগুয়ে, ১২. পেরু, ১৩. পোল্যান্ড, ১৪. স্পেন, ১৫. গ্রীস, ১৬. জর্জিয়া, ১৭. বুলগেরিয়া, ১৮. ইংল্যান্ড, ১৯. ডেনমার্ক, ২০. আইসল্যান্ড, ২১. নরওয়ে, ২২. ফিনল্যান্ড, ২৩. সুইডেন, ২৪. টোঙ্গা, ২৫. টুভালু, ২৬ স্কটল্যান্ড, ২৭. ফ্রান্স ও ২৮. হাঙ্গেরী।

রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধ এমন দেশগুলো হলো : ১. কম্বোডিয়া, ২. শ্রীলংকা, ৩. থাইল্যান্ড, ৪. মায়ানমার ও ৫. ভুটান। রাষ্ট্রধর্ম ইয়াহূদী আছে শুধু ইসরাঈলে। এছাড়া পৃথিবীতে খ্রিষ্টান, মুসলিম এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক রাষ্ট্র আছে যারা তাদের দেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বিশেষ কোনো ধর্মকে স্বীকৃতি না দিলেও জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য বজায় রেখে চলে। যেমন— যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, ইউক্রেন, আর্মেনিয়া, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান। আবার পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে নাস্তিকের সংখ্যা বেশি, যেমন- উত্তর কোরিয়া (৭১%), জাপান (৫৭%), হংকং (৫৬%) এবং চীন (৫২%)।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৫১৬ জন। মোট জনসংখ্যার ৯১.০৪ শতাংশ মুসলিম, ৭.৯৫ শতাংশ হিন্দু, ০.৬১ শতাংশ বৌদ্ধ, ০.৩০ শতাংশ খ্রিষ্টান এবং ০.১২ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। মুসলিমরা দেশের প্রধান সম্প্রদায়। তাই স্বাভাবিকভাবে এখানকার মুসলিমদের চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে, চলনে-বলনে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তথা সামগ্রিক জীবনে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক। সে কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোধ-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে ইসলামকে এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত যুগোপযোগী ও যৌক্তিক।

সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৮ সালের ৫ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী পাশের মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২ক যুক্ত করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৯ জুন, ১৯৮৮ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ এতে অনুমোদন দেন। অষ্টম সংশোধনীর ২ক-তে বলা হয় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে'। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণাকে বাংলাদেশী তাওহীদপন্থী মুসলিমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বাগত জানিয়েছেন। ব্যতিক্রম ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ ও নাস্তিক ঘরোনার লোক। তারা এই রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ বলে আখ্যায়িত করেন। সেই সাথে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষে ১৫ জন ব্যক্তি আদালতে রিট দায়ের করেন। রিট নম্বর ১৪৩৪/১৯৮৮। রিটকারী ১৫ জন হলেন— সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাবেক বিচারপতি কেএম সোবহান, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শিদ, আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত, বদরুদ্দীন উমর, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। তাদের আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে নানা ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ বাস করে। এটি সংবিধানের মূল স্তম্ভে বলা হয়েছে। এখানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে অন্যান্য ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতি ধ্বংসাত্মক। এ রিট দায়েরের দীর্ঘ ২৩ বছর পর ২০১১ সালের ৮ জুন একটি সম্পূরক আবেদন করা হয়। ঐ দিনই বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন। পাশাপাশি শুনানির জন্য অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে ১৪ জন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা হলেন— টিএইচ খান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ড. এম জহির, মাহমুদুল ইসলাম, এএফ হাসান আরিফ, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার আখতার ইমাম, ফিদা এম কামাল, ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি, আবদুল মতিন খসরু, ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, এএফএম মেসবাহ উদ্দিন। এ রুল জারির কিছুদিন পর একই বছর ২৫ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী করা হয়। এতে ২ অনুচ্ছেদ আবারও সংশোধন করা হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে'। এ সংশোধনীর পর আবারো সম্পূরক আবেদন করা হয়। এ আবেদনের পর ২০১১ সালের ১ ডিসেম্বর হাইকোর্টের একই বেঞ্চ সম্পূরক রুল জারি করেন। এরপর এ রুলের ওপর হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির জন্য ২০১৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আবেদন করেন রিট আবেদনকারী পক্ষ। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে রুল শুনানির দিন ধার্য করা হয় ২৭ মার্চ, ২০১৬। পরে একদিন পিছিয়ে রুল শুনানির জন্য রিট আবেদনটি কার্যতালিকায় আসে (সোমবার) ২৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে। বেলা ২টা ১২ মিনিটে এজলাসে বসেন বিচারপতি নাঈমা হায়দার, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ। অতঃপর 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষে এ রিটটি দায়েরের লোকাস স্ট্যান্ডি (রিট করার এখতিয়ার)

নেই বলে রিট আবেদনটির নিষ্পত্তি করে দেয় আদালত। ফলে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামই বহাল থাকে। আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী জগলুল হায়দার আফ্রিক ও সুব্রত চৌধুরী এবং রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা উপস্থিত ছিলেন। এদিন রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘এ রায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্ম বহাল থাকার পাশাপাশি অন্য ধর্মের অধিকারও বহাল থাকল। এটা সংবিধানেও রয়েছে। উল্লেখ্য, রায় ঘোষণার আগের দিন ২৭ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় রিট আবেদনকারীদের অন্যতম বদরুদ্দীন উমর গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে রিট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি রিট আবেদনটি পুনরুজ্জীবিত করায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘রিট মামলা পুনরুজ্জীবিত করা হলেও আমাকে জানানো হয়নি। আমার নামও তার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে। আমি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি, রাজনৈতিকভাবেই আমরা সে সময় আন্দোলন করেছিলাম এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু তখন যে পরিস্থিতিতে মামলা করা হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই’।

এরপরও ইসলামবিদ্বেষী চিহ্নিত মহলটি বসে থাকেনি। তারা বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। এরই ধারাবাহিক অংশ হিসেবে উচ্চ আদালতে নিষ্পত্তিকৃত ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ বাদ দিতে ২০২০ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিএনপি মহাসচিব, জাতীয় পার্টির মহাসচিব, গণফোরামের ড. কামাল হোসেন, জাসদের হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেননসহ ১০ জনকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান অশোক কুমার ঘোষ নামের একজন আইনজীবী। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ মাইনরিটি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অশোক কুমার সাহার পক্ষে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশটি পাওয়ার দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা লেখা শুরু করতে হবে। অন্যথা বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক জনগণের পক্ষে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হবে। নোটিশে তিনি আরো বলেন, ‘সংবিধানে ২ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজনের ফলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে’। সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দিয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ চালুর দাবিতে অশোক সাহার লিগ্যাল নোটিশ দেওয়ায় ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। মীমাংসিত বিষয় নিয়ে লিগ্যাল নোটিশ করায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও শুরু হয় ব্যাপক তোলপাড়, বইতে থাকে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়। সাংবিধানিক ও মীমাংসিত বিষয় নিয়ে এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ ও উস্কানিদাতাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জোর দাবি ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯ আগস্ট, ২০২০ বুধবার তিনি লিগ্যাল নোটিশটি প্রত্যাহার করে নেন। এখানেই শেষ নয়। ২০২২ সালে এসেও কিছু জ্ঞানপাপী এবং বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়াসী, ধর্মকর্মের সাথে সম্পর্কহীন, জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাতিল করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছে। লেখনী, বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সম্পর্কে উন্মাদের মতো প্রলাপ বকেছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামবিরোধীদের প্রলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ১. রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী? ২. রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। ৩. মানুষের ধর্ম থাকলেও রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকা উচিত নয়। ৪. ৭২ সালের সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও ইসলাম না থাকলেও যদি আমরা মুসলমান থাকতে পারি, তাহলে এখন সমস্যা কোথায়? ৫. কোনো বিশেষ ধর্মকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। ৬. রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করলে অন্য ধর্মগুলোকে খাটো করা হয়। ৭. সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম এক সঙ্গে থাকতে পারে না। ৮. একই সাথে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের জন্য ধর্ম শব্দ ব্যবহার হয় কীভাবে? ৯. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে অন্যান্য ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১০. বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতি ধ্বংসাত্মক আঘাত। ১১. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ের পরিপন্থী। ১২. সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। ১৩. বঙ্গবন্ধুর করা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে চাই। ১৪. সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা সাংঘর্ষিক। ১৫. বঙ্গবন্ধুর সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক থেকে মুক্ত করুন। ১৬. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম মানি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত প্রলাপমূলক বাক্যগুলো বাংলাদেশের একশ্রেণির তথাকথিত প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবী, মুক্তমনা, সুশীল, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদদের।

রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের বিষয়ে উপরিউক্ত মন্তব্যগুলো যারা করেন, তাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য জাতির কাছে স্পষ্ট। আসলে তাদের অধিকাংশই ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক শ্রেণির। একই সাথে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহীও বটে। তারা নিজেদেরকে নাস্তিক পরিচয় দিলেও আসলে তারা ইসলামবিদ্বেষী। উক্ত মন্তব্যকারীদের অধিকাংশই মুখোশধারী ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক। তাদের কাছে মানবতার ধর্ম ইসলামের চেয়ে বৈষয়িক স্বার্থই বড়। ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী এ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো— দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া, আবহমানকাল ধরে বিরাজমান সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করা, চাটুকারিতার মাধ্যমে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জুমআর দিনের আদব

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

জুমআর দিন মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কুরআন-হাদীছে এই দিনের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এই দিনের বহু আদব রয়েছে, যা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক নেকী অর্জন করতে পারি। আলোচ্য প্রবন্ধে জুমআর দিনের আদব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো—

১. জামাআতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করা : একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে ফজরের ছালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে দিন শুরু করতে হয়। আর জুমআর দিন এ ক্ষেত্রে আমাদের বেশি সচেষ্ট হওয়া উচিত। আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ 'সবচেয়ে উত্তম ছালাত হলো জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে ছালাত'।[১]

২. সূরা আল-কাহফ তেলাওয়াত করা : জুমআর দিন সূরা আল-কাহফ তেলাওয়াত করা সুন্নাত। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা আল-কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে'।[২]

৩. গোসল করা : জুমআর দিন গোসল করা সুন্নাত। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ 'তোমাদের কেউ যখন জুমআতে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন গোসল করে'।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ 'প্রত্যেক সাবালকের উপর জুমআর দিনের গোসল ওয়াজিব'।[৪] তবে এখানে উল্লেখিত আদেশ থেকে গোসল ফরয সাব্যস্ত হবে না; বরং তার অর্থ হলো গোসল উত্তম। সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ 'যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ওযু করল, তাহলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর যে গোসল করল, (তার) গোসল হলো সর্বোত্তম'।[৫]

৪. মেসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা : এ মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَه طِيْبٌ فَلَا يَضُرُّه أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

উবাইদ ইবনু সাব্বাক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক জুমআর দিন বলেছেন, 'হে মুসলিমগণ! এ দিন, যে দিনকে আল্লাহ তাআলা ঈদ হিসাবে গণ্য করেছেন। অতএব, তোমরা এ দিন গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলেও কোনো ক্ষতি নেই। তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মিসওয়াক করবে'।[৬]

৫. সুন্দর পোশাক পরিধান করা : জুমআর দিন সামর্থ্য অনুযায়ী সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوى ثَوْبَيْ مَهْنَتِه 'তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে, সে যেন তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমআর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক রাখে'।[৭]

৬. সকাল সকাল ছালাতের জন্য যাওয়া : জুমআর দিন সকাল সকাল ছালাতের জন্য রওনা হওয়া উচিত। আমাদের সালাফ এ কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। কেননা জুমআর দিন আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

---

* অনার্স ১ম বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫৬৬।

২. সুনান দারেমী, হা/৩৪৫০; মুসতাদরাক হাকেম, হা/৩৩৯২; ছহীহ তারগীব, হা/৭৩৬, ছহীহুল জামে', হা/৬৪৭০; মিশকাত, হা/২১৭৫।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮২, ৮৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৪, ৮৪৫; ইবনু মাজাহ, হা/১০৮৮; আবূ দাঊদ, হা/৩৪০; তিরমিযী, হা/৪৯২; নাসাঈ, হা/১৩৭৬; মিশকাত, হা/৫৩৭।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৮৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৬।

৫. তিরমিযী, হা/৪৯৭, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১০৯১; নাসাঈ, হা/১৩৮০।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/১০৯৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/১৩৯৮।

৭. আবূ দাঊদ, হা/১০৭৮, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১০৯৬; মিশকাত, হা/১৩৮৯।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জুমআর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। (অতঃপর তিনি বলেন,) যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেওয়ার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর যে লোক মসজিদে আসে তার উপমা হলো, যে একটি দুম্বা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি মসজিদে আসে তার উদাহরণ হলো, যে একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি মসজিদে আসে তার উপমা হলো, যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য বের হলে তারা তাদের দপ্তর গুটিয়ে খুৎবা শোনেন'।[৮]

৭. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া : জুমআর দিন পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে যানবাহন-সাওয়ারী ব্যবহার করা অনুচিত। আওস ইবনু আওস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَه بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا 'যে ব্যক্তি জুমআর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করবে ও নিজে গোসল করবে, এরপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে মাসজিদে যাবে, ইমামের নিকট গিয়ে বসবে, চুপচাপ ইমামের খুৎবা শুনবে এবং বেহুদা কাজ করবে না— তার প্রতি কদমে এক বছরের আমলের ছওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের ছিয়াম ও রাতের ছালাতের আমলের পরিমাণ ছাওয়াব হবে'।[৯]

৮. মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা : জুমআর দিনের আদবসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে, জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা। নিম্নের হাদীছটি এর গুরুত্ব বহন করে।

عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা সুলাইক গাতফানী জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ছালাত পড়েছ কি? লোকটি বললেন, না। তিনি বললেন, উঠো এবং হালকা করে দুই রাকআত পড়ে নাও। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুমআর দিন ইমামের খুৎবা দেওয়াকালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন (সংক্ষেপে) দুই রাকআত ছালাত পড়ে নেয়'।[১০]

৯. সম্ভবপর নফল ছালাত আদায় করা : শুধু জুমআর দিনই এমন একটি দিন, যেদিন ইমামের খুৎবার আগ পর্যন্ত দুই বা চার রাকআত করে সম্ভবপর নফল ছালাত পড়া যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّى مَا قُدِّرَ لَه ثُمَّ أَنْصَتَ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَه غُفِرَ لَه مَا بَيْنَه وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর ছালাত আদায় করতে এসেছে ও যতটুকু সম্ভব হয়েছে (নফল) ছালাত আদায় করেছে, ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে, এরপর ইমামের সাথে জুমআর ছালাত আদায় করেছে— তাহলে তার এ জুমআ থেকে বিগত জুমআর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[১১]

১০. মনোযোগের সাথে খুৎবা শ্রবণ করা : জুমআর দিনের গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে, জুমআর দিন মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনা। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَه مَا بَيْنَه وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصى فَقَدْ لَغَا 'যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে জুমআর ছালাতে যাবে, চুপচাপ খুৎবা শুনবে, তার এই জুমআ হতে ওই জুমআ পর্যন্ত সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরও তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর নাড়ল, সে অর্থহীন কাজ করল'।[১২] অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَ أَلْغَيْتَ يعَنِي وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ 'জুমআর দিন ইমামের খুৎবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআর ছওয়াব) বাতিল করলে'।[১৩]

---

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০; মিশকাত, হা/১৩৮৪।

৯. আবূ দাঊদ, হা/৩৪৫, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১০৮৭; মিশকাত, হা/১৩৮৮।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৯৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫; ইবনু মাজাহ, হা/১১১২; আবূ দাঊদ, হা/১১১৬।

১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭; মিশকাত, হা/১৩৮২।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭; আবূ দাঊদ, হা/১০৫০; তিরমিযী, হা/৪৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/১০৯০; মিশকাত, হা/১৩৮৩।

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫১; আবূ দাঊদ, হা/১১১২; নাসাঈ, হা/১৪০২; ইবনু মাজাহ, হা/১১১০; মিশকাত, হা/১৩৮৫।

১১. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে না বসা : জাবের হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا 'তোমাদের কেউ যেন জুমআর দিনে কোনো মুসলিম ভাইকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে বলতে পারে, ভাই! একটু জায়গা করে দিন'।[১৪]

১২. মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে অতিক্রম করে বা দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে না বসা : জুমআর দিন মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে অতিক্রম করে বা দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে বসা নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.

আবুয যাহিরিয়্যাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমআর দিনে আমরা নবী -এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে লোকদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর বললেন, একদা জুমআর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। নবী তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী বললেন, তুমি বসো, তুমি লোকদের কষ্ট দিয়েছো।[১৫]

১৩. খুৎবার সময় হাঁটুকে পেটের সাথে লাগিয়ে না বসা : জুমআর দিনের নিষিদ্ধ কর্মসমূহের মধ্যে খুৎবার সময় হাঁটুকে পেটের সাথে লাগিয়ে বসা অন্যতম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

মুআয ইবনু আনাস আল-জুহানী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জুমুআর দিন ইমামের খুৎবার সময় হাঁটু উচিয়ে দু'হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন'।[১৬]

১৪. জুমআর ছালাত পড়া : প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষের উপর জুমআর ছালাত ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 'হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর' *(আল-জুমুআ, ৬২/৯)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ.

তারেক ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জামাআত সহকারে জুমআ ফরয। অবশ্য চার ব্যক্তির জন্য ফরয নয়— ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ'।[১৭] জুমআর ছালাত ত্যাগকারীর জন্য নবী কঠিন হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও আবূ হুরায়রা বলেন, আমরা নবী -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'লোকেরা যেন জুমআর ছালাত ছেড়ে না দেয়। (যদি ছেড়ে দেয়) আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অমনোযোগীদের মধ্যে গণ্য হবে'।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে, ইবনু মাসঊদ বলেন, নবী এমন লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমআর ছালাতে উপস্থিত হয় না, তাদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করব, সে আমার স্থানে লোকদের ইমামতি করবে আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিব'।[১৯]

১৫. জুমআর ফরয ছালাতের পরে সুন্নাত ছালাত পড়া : জুমআর ফরয ছালাতের পরে মসজিদে চার রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। আবূ হুরায়রা বলেন, নবী বলেছেন, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا 'তোমাদের যে লোক জুমআর (ফরয ছালাতের) পর ছালাত আদায় করতে চায়, সে যেন চার রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২০] আর বাড়িতে পড়লে দুই রাকআত পড়া সুন্নাত। ইবনু উমার বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ 'নবী জুমার ছালাতের পর কামরায় পৌঁছার পূর্বে কোনো ছালাত আদায় করতেন না। কামরায় পৌঁছার পর তিনি দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন'।[২১]

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৯ নং পৃষ্ঠায়)

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭৮; মিশকাত, হা/১৩৮৬।
১৫. আবূ দাঊদ হা/১১১৮, হাদীছ ছহীহ।
১৬. আবূ দাঊদ, হা/১১১০, হাদীছ হাসান; তিরমিযী, হা/৫১৪; মিশকাত, হা/১৩৯৩।
১৭. আবূ দাঊদ, হা/১০৬৭, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৩৭৭।
১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৪; মিশকাত, হা/১৩৭০।
১৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫২; মিশকাত, হা/১৩৭৭।
২০. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮১; মিশকাত, হা/১১৬৬।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮২; মিশকাত, হা/১১৬১।

পড়াশোনা ও ভালো ফলাফলের কৌশল

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

শিক্ষার পূর্ণ ধারণা বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীতে। শিক্ষার তাগিদ দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমের সূরা আল-আলাক্বের প্রথমেই বলা হয়েছে—

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

‘পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন! আর আপনার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানত না’ *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১-৫)*।

উক্ত আয়াতসমূহে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে জানা, সৃষ্টিকে জানা, স্রষ্টাকে জানা এবং স্রষ্টা, সৃষ্টি ও তাঁর মাঝে মানুষের অবস্থান ও দায়িত্ব সচেতনতা অর্জন ও পালনের কৌশল অর্জন। কুরআনুল কারীমের এ আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করে যদি মানুষ শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় তাহলেই শিক্ষার পূর্ণতা ও সার্থকতা অর্জন সম্ভব।

শেখার আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও পরিবেশ :

কোনো কিছু শিখতে হলে শেখার আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকতে হবে। অর্থাৎ শেখার প্রবণতা ও শেখার বিষয়টির গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এ কাজটি খুবই কঠিন। কেননা, কেউ শত চেষ্টা করেও একটি রচনা মুখস্থ করতে পারছে না। আবার কেউ এক নজর দেখেই মুখস্থ করে ফেলছে। কারণ, যে শিখতে পারছে না, সে পড়াটি শেখার আগ্রহ নিয়ে পড়ছে না। আর যে শেখার আগ্রহ নিয়ে পড়ছে, সে অল্প সময়েই রচনাটি মুখস্থ করে ফেলছে। সুতরাং এ কাজটি অনেকের পক্ষে অসম্ভব। শিখতে চাওয়াটা খুবই কঠিন কাজ। কাজেই কিছু শিখতে চাইলে আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি পুরোপুরি থাকা চাই।

আবার মনে আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি না থাকলে সে কাজে সফল হওয়া যায় না। কেউ যদি মনে করে পরীক্ষায় পাশ করা বড় কঠিন কাজ। তাহলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সব সময় মনে রাখতে হবে অন্যরা যদি পারে, তাহলে আমিও পারব। মনে ভয় থাকলে সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায়। তাই মন থেকে ভয় দূর করে আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

কবির ভাষায়- ‘সকলে পারে যাহা আমিও পারিব তাহা’। এ আত্মবিশ্বাসের কথাটা বারবার স্মরণ রাখতে হবে। নিজেকে এগিয়ে নিতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে।

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, ‘যার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস নেই, তার শেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, তার কাছ থেকে উঁচুমাত্রার শেখার ধরন আশা করা যায় না। মূলত সে কিছুই শিখতে পারে না’।

পড়ালেখা করার পরিবেশ থাকা যেমন জরুরী, তেমনি আবার জরুরীও নয়। কেননা, মনে আগ্রহ থাকলে পরিবেশ কোনো বিষয় না। আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস ব্যক্তিকে যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। যেমন, বিভিন্ন মনীষীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাস্তার ধারে লাইট পোস্টের নিচে বসে পড়াশোনা করেছেন। তাই পরিবেশের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। পরিবেশ যার যেমন আছে, সেখানেই আগ্রহ সহকারে পড়াশোনা করতে হবে। তবে দরকার জায়গাটা শব্দমুক্ত ও নিরিবিলি। বিপরীত পক্ষে এমন লোকও আছে সামান্য শব্দেই যারা বিরক্তিবোধ করে। আবার কারো কানের কাছে হাঁতুড়ি পিটালেও গ্রাহ্য করে না। তবে আসল কথা হলো পড়ালেখায় পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া। পড়া মুখস্থ না হলে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। ব্রেনে অনেক সময় কাজ করে না। চেষ্টা করতে থাকলে আস্তে আস্তে হয়ে যায়। এজন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তি দরকার। কেননা, শরীর ভালো না থাকলে মনও ভালো থাকে না। কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। কাজেই স্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর তো একটা মেশিনের মতো। চালু রাখতে হলে এনার্জি দরকার। হাঁটাচলা, চিন্তা-ভাবনা, চোখ-কান এসবের পিছনে অনেক শক্তি খরচ হয়। এজন্য পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। ব্যায়াম করতে হবে। পরিমিত ঘুমাতে হবে। এসব বিষয় খেয়াল

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

রাখলে পড়ালেখার গতি বেড়ে যায়। ভালো কিছু করা সম্ভব হয়।

অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস একে অপরের পরিপূরক :

যেসব শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করে তারা সবাই অধ্যবসায়ী ও আত্মবিশ্বাসী। সাথে সাথে পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীলও বটে। অধ্যবসায় হলো, কোনো কাজে ব্যর্থ হলে সে কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য ধৈর্য ও সাধনার সাথে বারবার এমনকি শতবার চেষ্টা করা বা সক্রিয়ভাবে তৎপর হওয়া।

বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, 'আমার আবিষ্কারের কারণ আমার প্রতিভা নয়; বহু বছরের পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও ধৈর্যের ফলেই আমি আমাকে সার্থক করেছি'।

সুতরাং পড়াশোনা ও ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার জন্য অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম ও ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়।

পড়াকে আয়ত্ত করার কিছু কৌশল :

১. আল্লাহর নামে শুরু করা ও বেশি বেশি দু'আ করা।

২. নিয়মিত, বুঝে বুঝে, মনোযোগ সহকারে পড়া এবং তা খাতায় লিখে রাখা।

৩. লক্ষ্য বাস্তবায়নের আগ্রহ ও কৌতুহল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়াগুলো নোট করে রাখা।

৪. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে পরস্পর সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন থাকা।

৫. চরিত্রহীন, অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৬. নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষকের পাঠদান গ্রহণ এবং মূল বই বেশি বেশি অধ্যয়ন করা।

৭. হতাশা, দ্বিধা-সংকোচ দূরে ঠেলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। এ কথা ভাবা যাবে না— আমরা গরীব, চাকরি হবে কী হবে না, তাই এখন থেকেই একটা কিছু করা দরকার।

৮. প্রতিকূল পরিবেশ, নানা উপকরণের সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে পড়াশোনাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. ভুলেও কখনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে ভালোবাসায় নিজেকে জড়িয়ে পড়াশোনা নষ্ট যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই পড়াকে আয়ত্ত করা করা সম্ভব।

পরিবেশ ও পড়াশোনার উপকরণ :

নিরিবিলি পরিবেশের সাথে সাথে ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার কিছু উপকরণ প্রয়োজন। যা শিক্ষার্থীর টেবিলে সাজানো থাকবে।

১. পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কুরআন মাজীদ ও ইসলামী বইয়ের কিছু সমাহার থাকবে। মননশীল ও রুচিশীল মার্জিত লেখকদের কিছু বইও থাকবে। যা চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে।

২. নোট করার জন্য সাদা কাগজের শীট, ফাইল, স্ট্যাপলার, ভালো কলম, স্কেল, জ্যামিতি বক্স হাতের কাছে থাকবে।

৩. বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্রসমূহ সংগ্রহ করে ক্লিপে আটকে রাখা।

নিয়মিত মন দিয়ে বুঝে পড়া :

প্রতিদিন কম হোক আর বেশি হোক নিয়মিত পাঠ্যবই পড়া। কোনোদিন ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করে, মন মেযাজ ভালো না ছুঁতোয় কোনোদিন একেবারেই পড়াশোনা না করলে চলবে না। এটা জীবনের জন্য মারাত্মক ভুল। বরং ৫/৬ ঘণ্টা না হোক, অল্প সময় হলেও পড়াশোনাকে নিয়মিত করা। ভালো রেজাল্ট ও সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে চাইলে এর বিকল্প নেই।

ভালো রেজাল্টের পেছনে নিয়মিত পড়াশোনার ভূমিকা অপরিসীম। পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা, মন দিয়ে বুঝে পড়া, ভালো ফলাফলের সহায়ক। প্রেমের ভাবনা, অর্থের লোভ, শারীরিক বিলাসিতা ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের অন্তরায়। মনকে হীনমন্যতা, দুর্বলতা, অপারগতা থেকে মুক্ত করে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করা মেধা বিকাশের সোনালী সোপান।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক জ্ঞানের খোঁজে কোনো পথে চলবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন' *(তিরমিযী, হা/২৬৪৬, হাদীছ ছহীহ)*।

হিংসা : কারণ, নিদর্শন ও প্রতিকার

*[১৬ রবীউল আখের, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১১ নভেম্বর, ২০২২ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ছালাহ আল-বুদাইর** রাহিমাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি একক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি যুলুম, জবরদস্তি, অবাধ্যতা ও হিংসাকে হারাম করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নবী ও সরদার মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। আর যে তার অনুসরণ করে না, তার ইচ্ছা হতাশায় রূপ নেয়। দরূদ ও তাসলীম বর্ষিত হোক তার উপর, তার পরিবার, ছাহাবীদের উপর এবং যে তার রবের জন্য সিজদায় অবনত হয় ও তাঁর ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করে তার উপর।

হে মুসলিমগণ! তোমরা মহান অন্তর্যামী ও সম্যক অবগত আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে একমাত্র তাকেই ভয় করে চলো। নিশ্চয় রিযিক্ব সুনির্ধারিত এবং আয়ু লিপিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা কর, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন' *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

হে মুসলিমগণ! জীবনে মন্দ চরিত্র থেকে মুক্ত হওয়া এবং উত্তম চরিত্র ধারণ করা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য। আর হিংসার ব্যাধি ধ্বংসাত্মক ও নিকৃষ্ট চরিত্রের একটি। হিংসা হলো কলহের প্রবক্তা, বিষণ্ণতার বাহন এবং দুর্ভাগ্য ও হীনতার প্রতীক। পারিভাষিক অর্থে হিংসা হলো একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইয়ের কোনো নেয়ামত প্রত্যক্ষ করে সেটি তার থেকে বিলীন হয়ে নিজের অধিকারে আসার জন্য কামনা করা। হিংসুক ব্যক্তিকে চেনা যায় তার চাহনি ও কথার মাধ্যমে। এমনকি কোনো কোনো চাহনি কথা বলার চেয়ে অধিক মনের ভাব প্রকাশকারী হয়ে থাকে। একজন হিংসুকের আলামত তিনটি- তা হলো, সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার তোষামোদ করে, তার অনুপস্থিতিতে তার গীবত করে এবং তার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করে।

অন্যের নেয়ামত দেখে হিংসাকারী উক্ত ব্যক্তির থেকে সে নেয়ামতের বিলুপ্তি ব্যতীত সন্তুষ্ট হতে পারে না। সর্বোপরি সে তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে না এবং বিশাল প্রাপ্তিতেও পরিতৃপ্ত হয় না। হিংসুক যখন তার চেয়ে জ্ঞান, চরিত্র, অবয়ব, সম্পদ অথবা অন্য কোনো মর্যাদাকর বৈশিষ্ট্যের উপরে অবস্থানকারী ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেয় তখন সে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আপত্তি করে বসে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর ন্যায্য বণ্টনে ক্রোধান্বিত হয়।

সে আল্লাহর ফয়সালার মধ্যে ইনছাফ দেখতে পায় না এবং অন্য মানুষদেরকে আল্লাহর নেয়ামতের উপযুক্তও মনে করে না। উপরন্তু সে আল্লাহর নেয়ামতকে ঘৃণা করতে থাকে এবং এর মধ্যে নিহিত আল্লাহর হিকমতকে ভুলে যায়। সে আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তদের উপর যুলুম করতে চায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। জনৈক কবি বলেন, ওহে! আমার হিংসুককে বলে দাও... তুমি কি জানো! তুমি কার সাথে বেয়াদবি করেছ? তুমি তো আল্লাহর সাথে তার কর্মের ব্যাপারে বেয়াদবি করেছ... কেননা তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারনি। ফলে তিনি তোমার এই কর্মের প্রতিদানস্বরূপ আমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন... আর তোমার অর্জনের পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন।

আছমাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি জনৈক আরব বেদুঈনকে বলতে শুনেছি যে, হিংসুকের চেয়ে মাযলূমের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো যালেমকে আমি দেখিনি। কেননা

হিংসুকের নিত্যসঙ্গী দুশ্চিন্তা, স্থায়ী নিঃস্বতা, দিশেহারা বিবেক এবং সীমাহীন আফসোস। হিংসার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, এর মাধ্যমে বয়সের হ্রাস ও চিন্তার বিক্ষিপ্ততা ঘটে। ইবনুল মু'তায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হিংসা হলো শরীরের ব্যাধি তুল্য'।

আছমাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বেদুঈন পল্লীতে এমন এক বৃদ্ধ লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম যার ভ্রু-যুগল বয়সের ভারে দুচোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং তার বয়স ১২০ বছর হলেও তার মাঝে এখনো বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি অবশিষ্ট রয়েছে। আমি তাকে এ দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলল, আমি হিংসা বর্জন করেছি, ফলে শরীর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে'।

হে মুসলিমগণ! যার অন্তর পরিশুদ্ধ ও উন্নতি লাভ করেছে, সে তার অন্তরে নেয়ামতপ্রাপ্তদের প্রতি কোনো ধরনের ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ অনুভব করে না।

একটু আনছারী নেতৃস্থানীয় ছাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, তারা ছিলেন সহমর্মী ও অন্যকে অগ্রাধিকার দানকারী, আরব গোত্রসমূহের প্রতিবেশী হিসেবে সবচেয়ে উত্তম এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের গৃহকে নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর এই নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে যাদের প্রশংসা করেছেন, ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ 'মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে কোনো (না পাওয়ার দরুন) হিংসা অনুভব করে না' *(আল-হাশর, ৫৯/৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুহাজির ছাহাবীদেরকে যে সম্মান ও মান-মর্যাদায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন এ ব্যাপারে আনছার ছাহাবীগণ তাদের হৃদয়ে কোনো ধরনের হিংসা পোষণ করতেন না।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা হিংসুকদের ভর্ৎসনা করেছেন, তাদের কর্মকাণ্ডকে তিরষ্কার ও ঘৃণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 'অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে? *(আন-নিসা, ৪/৫৪)*। অর্থাৎ বরং তারা মানুষদের প্রতি হিংসা করে এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর নেয়ামত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে অফুরন্ত দিয়েছেন।

হিংসা হলো মারাত্মক পাপ এবং বড় ধরনের কবীরা গুনাহ, কেননা তা পুণ্যগুলোকে নিঃশেষ করে দেয়, পরিতাপকে দীর্ঘস্থায়ী করে এবং শান্তিকে বিদায় করে দেয়।

আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তার হৃদয়ে হিংসার অনল প্রজ্বলিত করেছে এবং স্বীয় উপার্জিত সৎআমলকে তার জ্বালানি বানিয়েছে। হায় আফসোস! ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে শয়তান বন্দি করেছে, উদাসীনতা দিকভ্রান্ত করেছে, ফলে সে তার দ্বীন ও নেক আমলকে বিকিয়ে দিয়েছে এবং পরিশেষে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিঃস্ব এবং ঘৃণিত অবস্থায়। শয়তান তার অনুসারী এবং বন্ধুদের থেকে এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই সে অর্জন করতে চায়।

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থেকো'।[১] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'যখন রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য (ইরান) সাম্রাজ্য তোমাদের অধিকারে আসবে তখন তোমরা কীরূপ সম্প্রদায় হবে? উত্তরে আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে যেরূপ আদেশ করেছেন আমরা ঐরূপই বলব। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অন্য কিছু কি বলবে না? তখন তোমরা পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ হবে, এরপর হিংসা করবে, অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে, এরপর শত্রুতা করবে'। কিংবা এরূপ কিছু কথা তিনি বলেছেন, 'অতঃপর তোমরা নিঃস্ব মুহাজির লোকদের কাছে যাবে এবং একজনকে অপরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবে'।[২]

একটু লক্ষ্য করে দেখুন তো! কীভাবে আয়েশী জীবনযাপন, পরস্পর ঈর্ষা, হিংসা, ছিদ্রান্বেষণ, শত্রুতা পোষণ, নিরাপরাধ ব্যক্তির রক্তপাত এবং নির্দোষ জীবন হরণ করে হলেও একে অন্যের উপর বিজয়ী হওয়ার বাসনার কারণে পরিণত হয়েছে। যামরা ইবনু ছা'লাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষেরা ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের সাথে

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৯।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬২।

থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা পরস্পরে হিংসায় লিপ্ত না হবে'।[৩] উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলেম হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার উচ্চ শ্রেণির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, নিম্ন শ্রেণির প্রতি অবজ্ঞা এবং তার ইলমের মাধ্যমে পার্থিব অর্থান্বেষণ পরিত্যাগ করতে না পারবে'।

হে মুসলিমগণ! কোনো ব্যক্তি তার চোখের পলক মেলে তাকালে সে তার মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে আর যে প্রত্যেক চাকচিক্যময় বস্তুর লালসা করে সে হতাশার মধ্যে পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি বিভিন্ন ভ্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যা অন্যায়ভাবে হিংসা-বিদ্বেষ ও সীমালঙ্ঘনের জন্ম দেয় তাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে ব্যক্তি হিংসুকের ভাষায় এরূপ বলে যে, আমি চাই অমুকের সম্পদগুলো আমার হোক! হায়! অমুকের পদটি যদি আমার হতো, হায়! অমুকের স্ত্রী যদি আমার হতো; এতে তো তার বিবেক লোপ পায়, কথা নোংরা হয়, কাজ খারাপ হয় এবং অবশেষে তার বোকামি ও হঠকারিতার কারণে সে বন্দি হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ﴾ 'আর যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না' *(আন-নিসা, ৪/৩২)*।

হে মুসলিমগণ! মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সবসময় হিংসা ও ভোগান্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সম্মান যত বেশি হয় তার প্রতি মানুষের বিদ্বেষ তত বৃদ্ধি পায়। মানুষের সম্মান-মর্যাদা যত বেশি পূর্ণতা পায়, হিংসুকদের হিংসা ততই ভয়ংকর হয়; ফলে তার দিকে হিংসুকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়, হীন ও নিঃস্বদের কুদৃষ্টি লেগে থাকে এবং চক্রান্তকারীদের তীর নিবদ্ধ থাকে। কবির ভাষায়, যে যশ-খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে; তার বিরুদ্ধেই হিংসুকরা চক্রান্ত করে এবং কুৎসা রটনাকারীরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। কেননা উচ্চ মর্যাদা ও সুখ্যাতি হিংসা-বিদ্বেষকে উস্কে দেয়।

যদি সম্মান, অগ্রগামিতা, নেতৃত্বের মোহ, সম্পদ, পদ ও ক্ষমতার লোভ না থাকত তবে কেউ সম্পদ-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করত না, হিংসার শিকার ব্যক্তিকে আল্লাহ যেসব মুক্তার মালা দিয়েছেন কোনো অত্যাচারী তা ছিনিয়ে নিতে চাইত না, তার মর্যাদা কুক্ষিগত করতে অগ্রসর হতো না এবং তাকে পরাজিত করতে দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালাত না।

আপনি যখন দেখবেন যে, মানুষের মধ্যে অন্ধত্বের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের মাঝে স্বার্থপরতা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এও দেখবেন যে, তারা পরস্পরকে মন্দ নামে ডাকে, পরস্পরকে কটাক্ষ করে, তারা পরস্পর মতবিরোধ করে, ঐকমত্য পোষণ করে না, হিংসা করে, বন্ধুত্ব করে না, কঠোর আচরণ করে, সদাচারণ করে না, পিছনে লেগে থাকে, সাহায্য করে না তখন জেনে রাখুন যে, তারা পরস্পরে ষড়যন্ত্রের মধ্যে বসবাস করছে। ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষ অবলোকন করেছে যে, যে ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে জীবনধারণ করে, সে দরিদ্রতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আরবগণ বলতেন, যে অন্যের জন্য কুয়া খুঁড়ে, সে নিজেই তাতে পতিত হয়।

হে মুসলিমগণ! কোনো দেহ হিংসামুক্ত নয় তবে সম্মানিত ব্যক্তি সেটাকে সুপ্ত রাখে, আর হীন ব্যক্তি তা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে হিংসা দেখে তা গোপন করে রাখে, হিংসার শিকার ব্যক্তিকে কষ্ট না দেয় এবং অন্তর, জিহ্বা ও হাত কোনো মাধ্যমেই তার ক্ষতি না করে, বাড়াবাড়ি বা যুলুম না করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তার মুখোমুখি না হয় তাহলে এরূপ হিংসার জন্য তাকে কোনো তিরস্কার বা লাঞ্ছনা গ্রাস করবে না।

হে মুসলিমগণ! হিংসুক ব্যক্তি অহেতুক বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, জরূরী বিষয়কে বিনষ্ট করে যা তার জন্য যথেষ্ট তা পর্যাপ্ত মনে করে না, এমনকি দুনিয়ার কোনো কিছুই তার চাহিদা মেটাতে পারে না। যার হৃদয় হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য উক্ত ব্যক্তির সম্মানহানি করা। তার নিকট যদি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়, তার সুন্দর অবস্থা ও কর্মের কথা বলা হয়, তখন সে অভিযোগের সুরে বলে, সে কি এরূপ বলেনি, সে কি এরূপ এরূপ করেনি? তার দোষত্রুটিগুলো এক এক করে তুলে ধরে ও প্রচার করে এবং তার সৎকাজ ও কীর্তিকে গোপন করে, যদিও তার দোষগুলো তার বিশাল কীর্তির

৩. ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮১৫৭, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩৮৬।

সামনে কিছুই নয়। হিংসুকের অভ্যাস এরকমই, সে তার সমকালীন লোকদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ করে, তার মুখের আক্রমণ থেকে কেউ রেহাই পায় না এবং সে কোনো সীমায় গিয়ে নির্বৃতও হয় না।

কাজেই হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে আপনার জন্য মানুষের রবই যথেষ্ট এবং শয়তানের কুদৃষ্টি থেকেও তিনিই যথেষ্ট।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

'বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকরীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে' *(আল-ফালাক্ব, ১১৩/১-৫)*।

أقول ما تسمعون وأستغفِر الله فاستغفِروه، إنَّه كان للأوابِينَ غفورًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা নেয়ামতদাতা ও শাস্তি প্রতিরোধকারীর (মহান রবের) জন্য। হে মুসলিমগণ! যেহেতু সর্বত্র হিংসুকদের হিংসার বিচ্ছু বিচরণ করছে এবং তাদের বিষাক্ত সাপ সকল ঘাটিতে ওত পেতে রয়েছে, সেহেতু আপনারা আল্লাহর নিকট তাদের অনিষ্ট ও চক্রান্ত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বাঁচতে যিকির-আযকারের মাধ্যমে সুরক্ষা গ্রহণ করুন, তাদের হিংসার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকুন, তাদের সাথে মেলামেশা ও উঠা-বসা পরিহার করুন এবং কঠিন রোগ, বক্র চিকিৎসা ও ভয়ংকর ক্ষতির কারণে তাদের নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

হে মুসলিমগণ! নেয়ামতকে প্রকাশ করা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের শামিল। তবে যখন কোনো মুসলিম হিংসুকের হিংসা ও কুদৃষ্টির আশঙ্কা করবে, তখন তা গোপন রাখবে। আছমাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তুমি হিংসুকের হিংসা থেকে নিরাপদ থাকতে চাও তাহলে তোমার বিষয়গুলো তার নিকট নিজের নেয়ামতকে গোপন রাখা। কেননা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে বলেছিলেন, ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ 'তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না; বললে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে' *(ইউসুফ, ১২/৫)*। অতএব যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন, তাঁকে নবুঅতের জন্য মনোনীত করবেন এবং উভয় জগতে মর্যাদার নেয়ামত প্রদান করবেন; তখন তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ভাইদের নিকট স্বপ্নের বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন হিংসা থেকে সুরক্ষার জন্য।

হে মুসলিমগণ! কাউকে যদি অন্য কোনো ব্যক্তির উন্নতি, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি বা ভিন্ন কিছু আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে; তাহলে সে যেন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করে। সাহল ইবনু হুনাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমের ইবনু রবীয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের কেউ (বদনযর লাগিয়ে) তার ভাইকে কেন হত্যা করে? তোমাকে মুগ্ধ করে এমন বিষয় দেখার পরে কেন তুমি বরকতের দু'আ করলে না?[৪] আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হিংসুকের হিংসা, বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র এবং যালেমদের যুলুম থেকে হেফাযত করুন।

আপনারা দরূদ ও সালাম পাঠ করুন সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও সুপারিশকারী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন; যিনি রহমত ও ছওয়াবের সুসংবাদদাতা, আযাবের সতর্ককারী, ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী এবং তাঁর পরিবারবর্গসহ সকল ছাহাবীদের উপর। হে মহানুভব, মহান দাতা আল্লাহ! তাদের সঙ্গে আপনি আমাদের প্রতিও সন্তুষ্ট হয়ে যান।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন, মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন এবং দ্বীনের শত্রুদের ধ্বংস করুন। হে আল্লাহ! আমাদের দু'আগুলো শ্রবণ করুন। হে কারীম! আপনি আমাদের আহ্বানগুলো কবুল করুন-আমীন!

৪. আহমাদ, হা/১৬০২৩, শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন।

বিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন

*-মাযহারুল ইসলাম**

আল্লাহর জ্ঞান অসীম। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে প্রাপ্ত সামান্য জ্ঞান দিয়ে মানুষ আজ বিজ্ঞানের বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা আজকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বসবাস করছি। যুগে যুগে বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে পদচারণ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে থিওরি প্রদান করে, যার মধ্যে কতিপয় বিশুদ্ধ ও কতিপয় ত্রুটিযুক্ত থিওরি পাওয়া যায়। আর এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আজকে যেটা বিজ্ঞান কালকে সেটা বিজ্ঞান নয়। কেননা মানুষের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান অপরিপূর্ণ আর আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ। ইসলামের ভিত্তি যুক্তি বা বিজ্ঞান নয়, বরং ভিত্তি হলো বিশ্বাস তথা ঈমান। হ্যাঁ! প্রিয় পাঠক! আপনি হয়তো চমকে উঠলেন 'আজকে যেটা বিজ্ঞান কালকে সেটা বিজ্ঞান নয়' এটা শুনে। এই তো এ্যারিস্টেটল যখন বললেন, 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে' তখন তার এই থিওরি বিনা বাক্যে মানুষ মেনে নিয়েছিল। অতঃপর যখন বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস বললেন, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে' তখন সকলেই এই মতের বিরোধিতা করল ও আপত্তি পেশ করল। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানী পিথাগোরাস যখন বললেন, 'পৃথিবী ঘোরে, কিন্তু সূর্য স্থির'। অপর দিকে মিশরীয় বিজ্ঞানী টলেমী বলেন, 'সূর্য ঘুরে, পৃথিবী স্থির'। তাহলে দেখুন বিজ্ঞানীদের একটি থিওরি যেমন আজকে বিজ্ঞান, ঠিক আরেক সময় ঐ থিওরি বিজ্ঞান নয়। আমি নিজেই এই কথার বিপক্ষে অবস্থান করেছি। যখন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করলাম এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক বই, প্রবন্ধ পড়ে থিওরির সাথে তুলনা করলাম তখন বিষয়টি স্পষ্ট ও অনুমেয় হয়েছে এবং সেই সাথে একমত পোষণ করলাম 'বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল'। এটা সত্য যে, বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধান করে কিন্তু সত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে না। বিজ্ঞান শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে গবেষণার দ্বারকে উন্মুক্ত করে। পুরোপুরি সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। বিজ্ঞানীগণ বলেন, Science gives us but a partial knowledge of reality. অর্থাৎ 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'।

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তথ্য ও অনুসন্ধানের জন্য অপরিবর্তনশীল জ্ঞানের উৎস কী? জবাব হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার যার মধ্যে রয়েছে সকল জ্ঞানের উৎস ও সমাহার। এই সেই কুরআন যার মাধ্যমে জ্ঞানে মুসলিমগণ দীর্ঘ ১ হাজার বছর যাবৎ বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়। উইলিয়াম ড্রেপার রচিত 'Intellectual development of Europe' বইয়ে বলেন, বড়ই আফসোসের বিষয় পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান ও অগ্রগতিকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের এই বিদ্বেষ বেশিদিন চাপা থাকেনি। এটা নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ইমানুয়েল ডাস বলেন, A book by the aid of which Arabs conquered a world greater than that of Alexander the Great, greater than that of Rome. অর্থাৎ 'এই কুরআন, যার দ্বারা আরবরা জয় করেছিল পৃথিবীর বিস্তৃত দেশ যা আলেকজান্ডার এর চেয়েও বড়, রোম (ইতালি) সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়'।

আর এটা চরম সত্য যে, যুগে যুগে বিজ্ঞানীগণ কুরআনের নির্ভেজাল তথ্যের উপর নির্ভর করে মানবকল্যাণের জন্য বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই যে দেখুন, গ্যারি মিলার (কানাডার খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক) কুরআনের ভুল খুঁজতে গিয়ে সূরা আন-নিসার ৮২ নম্বর আয়াত পড়তে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হন। যেহেতু স্বতঃলব্ধ জ্ঞান মানসিকতার সাথে পরিবর্তনশীল, তাই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা চলমান। কিন্তু যিনি সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তার জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সর্বদা অপরিবর্তনশীল। অথচ আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই নাস্তিক এবং এক শ্রেণির কপট বিজ্ঞানী বিদ্বেষবশত ইসলাম ও আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান করে খোঁড়া যুক্তি পেশ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুখ্যাতি অর্জন করতে চায়। অথচ ঐ সকল বিজ্ঞানীদের গুরু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের (১৯৭৯-১৯৫৫) এই কথা মনে রাখা উচিত, তিনি বলেন, Religion without science is blind and science without religion is lame. অর্থাৎ 'বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু'। এক্ষেত্রে ইসমাঈল আল-রাজীর কথাটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি। তিনি বলেন, God (Allah) is not against science, God (Allah) is the condition of science, not an enemy of science. অর্থাৎ 'আল্লাহ বিজ্ঞানের বিরোধী নন, আল্লাহ হচ্ছেন বিজ্ঞানের শর্ত, তিনি বিজ্ঞানের শত্রু নন'।

আজ সারা বিশ্বে অমুসলিমগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিচ্ছে

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

এজন্য হয়তোবা আমরা মনে করছি অমুসলিমগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখছে! এরকম শত অজুহাত ও অযাচিত যুক্তি উপস্থাপন করে আমরা বিজ্ঞান থেকে বিমুখ হচ্ছি। আসলে সত্য কথা হলো বিজ্ঞান তেমন কোনো আহামরি বিষয় নয়! বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য। কেননা সকল জ্ঞানের উৎস আল-কুরআন তাদের প্রতিদিনের পড়ার সিলেবাস। যে কুরআন নিয়ে বেশি গবেষণা করবে সে তত বেশি জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় পদচারণ করে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে পারবে। আসলে আমরা ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছি। আমরা অতীতের ইতিহাস একটুও পড়ি না।

অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় মুসলিমগণ নেতৃত্ব দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

(১) গণিতশাস্ত্রের মধ্যে বীজগণিতের জনক বলা হয় মূসা আল-খাওয়ারিজমীকে। অপর দিকে উমার খৈয়াম ছিলেন প্রথম শ্রেণির এক অন্যতম গণিতবিদ। আল-বিরুনী গণিতশাস্ত্রে বিশ্বখ্যাত ছিলেন। এছাড়াও অনেক মনীষী গণিতশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং অমূল্য জ্ঞানের খোরাক হিসেবে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, যা আজও পাশ্চাত্য সমাজ গবেষণা করে নতুন নতুন থিওরি আবিষ্কার করছে।

(২) জাবির ইবনে হাইয়ানকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। তিনি রসায়নের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে প্রায় ৫০০টি আর্টিকেল রচনা করেন। তার রচিত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'বুক অব দ্য সেভেন্টি' গবেষণা করে পরবর্তীতে অনেক মুসলিম পণ্ডিত রসায়নের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি সাধন করেন।

(৩) পদার্থবিজ্ঞানে আল-কিন্দী, আল-বিরুনী, হাসান ইবনে হায়সাম, ইবনে সিনা প্রমুখ অনেক অবদান রাখেন।

(৪) উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানে ইবনে বাজা, মুহাম্মাদ আদ-দামেরী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

(৫) চিকিৎসাবিজ্ঞানে আল-রাজী, ইবনে সিনা প্রমুখ অনেক অবদান রাখেন। এছাড়াও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের অবদান অসামান্য। কিন্তু আজকে মুসলিমদের সেই অবিস্মরণীয় অবদানকে পাশ্চাত্যের জ্ঞানপাপী সমাজ আমাদের দৃশ্যপট থেকে আড়াল করে রেখেছে এবং নিজেদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করছে যেন মনে হয় তারাই সব কিছু করেছে। পাশ্চাত্য সমাজ আমাদেরকে মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞানে অবদান কোনোমতেই জানতে দিবে না বলেই মুসলিমদের নাম বিকৃত করে আমাদের সামনে পেশ করেছে, যেমন-

(১) আল-রাজীর নাম বিকৃত নাম করে বলে রাজম।
(২) ইবনে সিনার বিকৃত নাম ইভান সিনা (হিব্রুতে) এভি সিনা (ল্যাটিন)।
(৩) আল-খাওয়ারিজমীর বিকৃত নাম আল-গরিটাস, আল-গরিজম, আল-গরিদম ইত্যাদি।
(৪) ইবনে হায়সামের বিকৃত নাম আল-হাজেন।
(৫) জাবির ইবনে হাইয়ান এর বিকৃত নাম জিবার।
(৬) আল-কিন্দীর বিকৃত নাম আল-কিন্দাস।

সুধী পাঠক! আপনি যদি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভ্রান্ত নির্ভেজাল মেসেজ আল-কুরআন বেশি করে স্টাডি করুন। তাহলে আপনার সামনে বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য ভেসে উঠবে। এই যে দেখুন জিএম রাওউর বলেন, আল-কুরআন হচ্ছে জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। ডক্টর মরিস বুকাইলি একটি বিশ্বস্বীকৃত নাম, তিনি বলেন, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের সত্যকে নতুন করে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করছে।

কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের প্রত্যেকটি বর্ণ, শব্দ, সূরা, পারা, রুকূ, সিজদা বিজ্ঞানময় এবং কুরআনে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে সকল বিষয়ের বিজ্ঞানময় সমাধান পেশ করা হয়েছে, যা আমরা আজকের যুগে গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারছি। তন্মধ্যে আমরা এখানে কিছু উদাহরণ পেশ করলাম। যেমন-

(১) চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। এই থিওরি সূরা আল-ফুরক্বানের ৬১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

(২) বিগ ব্যাং থিওরি সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা আল-আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে।

(৩) রাত-দিনের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে বলা হয়েছে সূরা লুক্বমানের ২৯ নম্বর আয়াতে।

(৪) ফিঙ্গারপ্রিন্ট তথা আঙুলের ছাপ দিয়ে মানুষকে চিহ্নিত করার রহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা আল-ক্বিয়ামাহ এর ৩৩ ও ৩৪ নম্বর আয়াতে।

(৫) চাঁদ ও সূর্যের নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণের রহস্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে সূরা আল-আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে।

পরিশেষে বলতে চাই, সভ্যতা বিনির্মাণে বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য। এজন্য বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম মানার যৌক্তিকতা বোকামি বৈ কিছুই নয়; বরং ধর্ম দিয়ে বিজ্ঞান মানাই হলো কল্যাণকর এবং বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে বিজ্ঞানের কিংবদন্তি অবদান সঠিকভাবে বুঝে তার ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া একান্ত কাম্য।

তথ্যসূত্র :

১. উইকিপিডিয়া।
২. মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৩. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলি।
৪. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- মুহাম্মদ নুরুল আমিন।

ভার্চুয়ালে যেভাবে আপনি গুনাহগার হচ্ছেন

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

বর্তমানে মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। ডিজিটাল বিশ্বে দৈনন্দিন জীবনযাপনে এসবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন আজ এসব ছাড়া যেন একেবারেই অচল। এসব ডিভাইস দ্বারা আমরা প্রতিনিয়তই যুক্ত থাকি ভার্চুয়াল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে।

আজ আমাদের জীবনযাপন এমন হয়ে গেছে যে, টাকা-পয়সা ছাড়া একদিন চলতে পারলেও ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ছাড়া এক মুহূর্তও কল্পনা করতে পারি না। যার ফলে ভার্চুয়াল জগতের প্রতি আমাদের এই আসক্তি ক্রমান্বয়ে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদেরকে অনেক সময় ধীরে ধীরে দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

এসব ডিভাইস শুধু একটি শ্রেণি নয়, বরং সমাজের প্রতিটি শ্রেণি ও বয়সের মানুষকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে নিয়েছে। ভার্চুয়াল জগৎ আমাদের এমনই আসক্ত করেছে যে, তা আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার জ্ঞানকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কী দেখছি, কী করছি, কী দেখাচ্ছি? ভার্চুয়াল বিশ্ব আজ আমাদের তাদের গোলামে পরিণত করেছে। বিশেষ করে মুসলিমদের।

মুসলিমরা একটি নির্দিষ্ট দ্বীনে জীবনযাপনে বাধ্য। আমরা সেই জীবনযাপনই করতে পারব, যা আমাদের দ্বীন অনুমতি দেয়। যার ফলে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলাম একটি নির্দিষ্ট বলয়ে সুরক্ষিত ছিল। যেখানে সকল মুসলিম দ্বীন ইসলাম পালনে আন্তরিক এবং বাধ্য ছিল।

কিন্তু আধুনিক বিশ্বে বর্তমান অশ্লীলতার যুগে অনেক মুসলিম তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারছে না। আজ আমরা নিজেরই অজান্তে প্রতিনিয়তই দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বর্তমান ফেতনার যুগে ভার্চুয়াল জগৎ এমনই একটি মাধ্যম, যে মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের ঈমান ও আমল আর ধরে রাখতে পারছে না।

বিশ্বে আজ এমন কেউ নেই যারা ইন্টারনেটসহ ফেইসবুক, ইউটিউব, টিকটক, লাইকিসহ অন্যান্য আরও সামাজিক ও অসামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে না। আর এসবের মাধ্যমেই আজ মুসলিমরা ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। এই শুভংকরের ফাঁকি মুসলিমদের বুঝা বড় দায় হয়ে গেছে।

ইসলাম তার প্রাত্যহিক জীবনে যা যা করতে আদেশ দেয় এবং যা যা করতে নিষেধ করে, তার সবই বিপরীত করতে বাধ্য করছে এই ভার্চুয়াল মাধ্যমগুলো। ফলে মুসলিমরা দ্বীন ইসলামের বিপরীতে আমল করে গুনাহগার হচ্ছে। আর আমরা অধিকাংশই জানি না কীভাবে আমাদের গুনাহের ভাগ দিনদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে আমরা যা যা করি তার সবই এই জগৎ সংরক্ষণ করে এবং অন্যদের নিকট তা প্রচার করে। ফলে কোনো ভালো কাজ করলে তার সুফল আমরা যেমন পাব। ঠিক তেমনি খারাপ কাজের ফলাফলও আমাদের আমলে যুক্ত হবে।

আজ ভার্চুয়াল জগতে ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, লাইকিসহ অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে। যেসব মাধ্যমে ভালোর চাইতে খারাপের কাজই হচ্ছে বেশি। দ্বীন ইসলামবিরোধী এসব কাজ যে মুসলিম তৈরি করে তার পাপের মাত্রা সবচাইতে বেশি। কেননা সে অন্যকেও পাপের কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করছে।

এখন এই পাপের কাজে যত মানুষ জড়িত হবে, তত জনের পাপের সমান ভাগীদার ঐ ব্যক্তি হবে, যে এই পাপ সৃষ্টি বা তৈরি করেছে। একইসাথে আমরা যখন নিজেরা এসব দেখি, তখন শুধু ব্যক্তি একক পাপের ভাগীদার হচ্ছি। কিন্তু যখন আমরা শেয়ার, লাইক, কমেন্ট ইত্যাদি করার মাধ্যমে এসব আরও দশজনকে দেখার এবং পাপ করার সুযোগ দিচ্ছি, তখন তাদের পাপও আমাদের আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে।

আর ভার্চুয়াল জগৎ এমন একটি মাধ্যম, যেখানে কোনো কিছু একবার প্রকাশ করলে তা আজীবন থেকে যায়। তাই কেউ কোনো খারাপ কিছু একবার প্রকাশ করলে, তা

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

আজীবন সবার কাছে প্রকাশিতই হতে থাকবে। আর ইসলামে খারাপ কিছু যতই প্রকাশিত হবে, ততই তার প্রাপ্য ঐ ব্যক্তির আমলে যুক্ত হবে। যা আমাদের অধিকাংশ মুসলিমই চিন্তা করে না।

ইসলামে গান-বাজনা, অশ্লীলতা এবং দুনিয়ামুখী খারাপ চিন্তাভাবনাকে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। তাই যারাই এসব ছবি, ভিডিও কিংবা কন্টেন্ট তৈরি করে, দেখে এবং অন্যকে দেখার জন্য উৎসাহিত কিংবা বাধ্য করে, তারা উভয়ই পাপের ভাগীদার। সুতরাং ভার্চুয়াল জগতের মাধ্যমে ঐসব মুসলিম পাপের ভাগী হচ্ছে, যারা এসব তৈরি করে, যারা শুধুই দেখে, আর যারা এসব নিজেও দেখে এবং শেয়ার করার মাধ্যমে অন্যকেও দেখার সুযোগ কিংবা বাধ্য করে।

আজ আমরা দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এসব বিষয় ঘূর্ণাক্ষরেও চিন্তা করি না। অথচ এসব নীরব পাপে প্রায় প্রতিটি মুসলিম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা বুঝতেই পারছি না আমরা কীভাবে নিজে অংশ না নিয়েও পাপ কামাই করছি।

একইসাথে আমাদের প্রতিটি বয়সের অধিকাংশ মানুষ পাবলিক প্লেসে এমনভাবে মোবাইল ব্যবহার করে, যা অন্যের বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন যানবাহনে কিংবা ওপেন প্লেসে আমরা ইয়ারফোন ছাড়াই উচ্চ শব্দে নাচ-গানসহ বিভিন্ন ভিডিও দেখি। যা অনেকেই পছন্দ করে না। একইসাথে তা শালীনতা বিবর্জিত কাজও বটে।

এভাবে প্রকাশ্যে অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখার কারণে, অনেকেই এর সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পৃক্ত হয়। যা ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ। এখন প্রকাশ্যে এসব অশ্লীলতার কারণে অন্যের পাপের ভাগও তাকে বহন করতে হবে।

তাই আজ থেকেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত এই নীরব পাপ থেকে। যেসব সামাজিক মাধ্যমের কারণে দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে পালন করা যায় না। কিংবা যেসব মাধ্যমে আমরা পাপ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, সেসব মাধ্যম কিংবা এ্যাপস ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

একই সাথে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে সেখান থেকে আমরা পাপের ভাগীদার না হই। সেই সাথে অনৈসলামিক ছবি, ভিডিও কিংবা কন্টেন্ট থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে। এমন কোনো কিছু কখনোই প্রকাশ কিংবা প্রচার করা উচিত হবে না, যে কারণে তা আমাদের পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

বিশেষ করে ফেইসবুকে আমরা হাসি-তামাশার ছলে এমন এমন কিছু শেয়ার কিংবা প্রকাশ করি, যা দ্বীনের মানদণ্ডে পাপ বলে সাব্যস্ত হয়। তাই অনৈসলামিক কোনো কিছু শেয়ার করা থেকে বিরত থাকি। একই সাথে সামাজিক মাধ্যমে এমন কোনো কিছু লাইক, কমেন্ট করা উচিত নয়, যা করলে অন্যরাও তা দেখতে পেয়ে পাপের ভাগীদার হয়।

একইভাবে প্রকাশ্যে কোনো ছবি বা ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকি, যা অন্যের জন্য বিরক্তিকর ও পাপের কারণ। সেইসাথে মুমিন নারীদের উচিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো নারীর ছবি কিংবা ভিডিও আপলোড না করা। কেননা যত জন পরপুরুষ এই ছবি ভিডিও দেখে পাপ অর্জন করবে, ঠিক একই পরিমাণ পাপ ঐ নারীর জন্যও লেখা হবে।

সুতরাং আসুন! সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা ইন্টারনেট কিংবা ভার্চুয়াল জগৎ ব্যবহারে সাবধান এবং সংযত হই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন।

ঝরে যাক জীবনবৃক্ষের গুনাহপাতা

-আবির

ঘোঁ ঘোঁ ঘোঁ,,, বালিশের নিচে ভাইব্রেট (vibrate), ফোনটা কেঁপে উঠল। ভোরবেলার শান্ত ঘুমের সোহাগমাখা ছোঁয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে বারবার। তবুও কিছুটা ঘুমঘোরের মধ্যেই একরাশ বিরক্তিবোধ নিয়েই ফোনটা রিসিভ করলাম। —হ্যালো...! কে? —সালাম কালাম নাই হ্যালো মারাচ্ছিস না! —কী হয়েছে বল। এত সকালে কেন ফোন দিয়েছিস? অযথা আরামের ঘুমটা হারাম করলি। —কী...! এখনো ঘুমাচ্ছিস? ঘড়ির দিকে তাকাতো। ব্যাডমিন্টন খেলবি না?

ব্যাডমিন্টনের কথা শুনতেই মনটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল আমার। আমি ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসি। প্রত্যহ সকালে খেলিও। শীতঋতুর প্রতিটা সকাল আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলার সময়। আসলেই শীতে কোঁকড়ানো শরীরে ব্যাডমিন্টন খেলার যে উষ্ণ অনুভূতি, তা অতুলনীয়। আজকেও মন চাইছে খেলতে। কিন্তু লেপের উষ্ণ অনুভূতি আমাকে বেড়িবদ্ধ করে রেখেছে। আর এমন শীতের দিনে কার-বা বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে! তবুও বহু কষ্টে শীতের ছোঁয়াকে পরাজিত করে উঠে পড়লাম। পছন্দের সেই কালো রঙের সোনালি কারুকার্যযুক্ত চাদরটি গায়ে জড়িয়ে কফি হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শীতের সকালটা বড্ড উপভোগ্য। শীতের কুহেলিকাবিধৌত মিষ্টি এক ভোর। শিশিরভেজা অবনি। এখনো প্রকৃতিটা তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে শুভ্র আলোর ফোয়ারা ছড়াচ্ছে সূর্য। মনে হচ্ছে, যেন সূর্যের মিষ্টি আলো ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার আপাদমস্তক। চারিদিকে শুরু হয়েছে পাখিদের কিচিরমিচির। ফোন করেছিল তাহসান। আমার বন্ধু। বেস্ট ফ্রেন্ড। সে নিশ্চয়ই সেই ফজরে উঠেছে। ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাত পড়েছে। তারপর পাখিদের সুরে সুর মিলিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে ফোন করেছে আমায়।

আমি জ্যাকেট, মোজা-জুতা ও একটি মোটা টুপি পরে নিলাম। বাহিরে লু হাওয়া বইছে। পৌষের হাড় কাঁপানো শীত বলে কথা। অল্প দূরের জিনিসগুলোও কুয়াশাচ্ছন্ন, দেখাই যাচ্ছে না। বাইরে বেরোনো মুশকিল। তবুও বেরোলাম। ওদিকে হয়তো তাহসানও বেরিয়েছে। দুজনের দেখা হলো তিন মাথার মোড়ে। এখান থেকেই আমাদের বাড়ির রাস্তাদ্বয় দু'দিকে চলে গেছে। তারপর চললাম তাহসানদের বাগানে।

বাগানে এসে জুতা-মোজা খুলে ফেললাম। যেন শিশিরভেজা সবুজ ঘাস আমাদের আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে। খেলা শুরু করলাম। প্রথম গেমটা তাহসান দিল। দ্বিতীয়টা আমি। আজকের বিজয়ী নির্ধারণ করতে তৃতীয়বারের মতো খেলা শুরু করলাম। খেলতে খেলতে হঠাৎ করে মারতে গিয়ে একটা ঢিলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ককটা উড়ে গিয়ে পড়ল অদূরের একটি ছোট্ট কদম গাছের ডালে।

পায়ে কিছুটা ব্যথা পেলাম। লক্ষ করলাম বুড়ো আঙুলটা থেকে খানিকটা রক্ত বের হয়েছে। উঠে এসে কদম গাছটির গোড়ায় বসলাম। তাহসানকে বললাম, গাছ থেকে ককটা নামা। আজ আর খেলতে পারব না। চল বাড়ি যাই। তাহসান কদম গাছটির ডাল ধরে জোরে একটা ঝাকুনি দিল। এতে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে লাগল। দ্বিতীয়বার ঝাকুনি দিতেই পাতার সাথে সাথে ককটাও নিচে পড়ল। এরপর দু'জন বাড়িমুখী হলাম। পায়ে ব্যথা পাওয়ায় কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলাম। তাই তাহসান আমার হাতটা শক্ত করে ধরল, যাতে আমার চলতে কিছুটা হলেও সুবিধা হয়। দু'জনে নীরবে হাঁটছি। নীরবতা ভেঙে তাহসানকে বললাম, কিরে! চুপ করে আছিস কেন? কিছু একটা বল! —কী বলব? বলার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না! —ওম্মা! খুঁজে পাচ্ছি না! এমনি সময় তো খুব বকবক করিস। তাহসান কিছুক্ষণ মাথা চুলকাতে চুলকাতে আচমকা মুখ ফুটিয়ে বলল, এই আবির! দেখলি না, কক নামাতে গাছের ডালে ঝোঁক দিতেই কেমন পাতাগুলো ঝরে পড়ছিল! —হু। তো কী হয়েছে? শীতে তো এমনিতেই গাছের পাতা ঝরতে থাকে। —এই পাতাঝরা নিয়ে একটা হাদীছের গল্প আছে। —পাতাঝরা হাদীছের গল্প! ইন্টারেস্টিং তো! বল দেখি। —শোন্ তবে... শীতের সময়। কুয়াশায় চাদরাবৃত হয়ে রয়েছে প্রকৃতি। শিশিরে অবগাহন করছে সবকিছু। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সমীরণ বইছে। গাছপালা থেকে শীতে নরম হওয়া **পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। এমন এক সময় মন ছুঁয়ে** যাওয়া প্রকৃতিতে বের হলেন ধরিত্রীর রাহবার মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সাথে আছেন আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটা গাছের নিকটে আসলেন। গাছটির দুটি ডালকে হাত দ্বারা চেপে ধরলেন। ঝাঁকি দিতে লাগলেন স্বজোরে। এতে শীতের নরম কোমল ছোঁয়ার আবেশে চুপসে যাওয়া পাতাগুলো ঝরে পড়তে লাগল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এই দৃশ্য দেখিয়ে বললেন, অবশ্যই যদি মুসলিম বান্দা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছালাত আদায়

করে, যেই ছালাতে থাকে না কোনো লোক দেখানোর অভিপ্রায়। থাকে না অলসতা-অবহেলা। থাকে খুশূ-খুযূ। ছালাত হয় শর্তানুযায়ী, রুকনসহ। ছালাতে থাকে বিনয়াবনত ভাব। একমাত্র ছোয়াবের আশায়, রবের আদেশ পালনার্থে। মনবাসনায় থাকে শুধু রবকে খুশি করার স্পৃহা। তাহলে কী হবে জানো? পাতাগুলোর দিকে তাকাও! কেমন ঝরে ঝরে পড়ছে। ঠিক তেমনি এই মুছল্লীর জীবনবৃক্ষ থেকে গুনাহপাতা ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে।[১]

—ছালাতের এত শক্তি! জানতাম না আগে। আমি অবশ্য ছালাত বিষয়ে আমাদের মসজিদের খত্বীবের মুখে একটা হাদীছ শুনেছিলাম। কী যেন হাদীছটা ...ভালোভাবে মনে পড়ছে না। তবে নদীতে গোসল করা নিয়ে কিছু একটা!

তাহসান গালে হাত দিয়ে কী যেন বিড়বিড় করছে... নদীতে গোসল করা নিয়ে হাদীছ ...ও হো! মনে পড়েছে। আমাদের গুনাহগুলো আছে কিনা? সেগুলো আসলে ময়লা-আবর্জনা। আমরা যে গুনাহের কাজ বা খারাপ কাজ করি, সেগুলো একটা একটা করে আমাদের অন্তরে এসে জমা হয়। একটা সময় পুরো অন্তরটাকেই ছেয়ে ফেলে এই গুনাহ নামক ময়লা। ফলে আমাদের অন্তর আস্ত একটা ময়লার ডাস্টবিনে পরিণত হয়ে যায়। একটা জায়গা ময়লা-আবর্জনায় ঢেকে গেলে যেমন সেখানকার মাটি-ঘাস আলো-বাতাস পায় না, ঠিক তেমনি গুনাহে ছেয়ে যাওয়া অন্তরও খুঁজে পায় না স্বস্তি-শান্তি। ভালো-মন্দ সবই তার কাছে এক ঠেকে। এই নোংরা হৃদয়কে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে এই ছালাত। এখানে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি উপমা দিয়েছেন, 'যদি কারো বাড়ির অদূরে একটা বহতা নদী থাকে। সে যদি সেখানে অহর্নিশ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? না। অবশ্যই থাকবে না। ঠিক ছালাতও এই বহমান নদীর মতোই।[২] যে পরিষ্কার করে হৃদের কলুষতা। মনকে ছেয়ে ফেলা গুনাহের বংশকে করে দেয় নির্বংশ। বৃষ্টি যেমন প্রকৃতিকে ধুয়ে নতুন সাজে সাজায়, ঠিক তেমনই ছালাত হৃদয়ের নোংরা ভাবনাগুলোকে ধুয়ে ফেলে সুন্দর ভাবনাগুলোকে ডানা মেলে উড়তে শেখায়। বিরত রাখে খারাপ কাজ থেকে। অন্তরের আঁধারকে দূর করে জোসনার ঝলমলে আলো দ্বারা। ঈমানকে পাহাড়ের মতো মযবূত করে। আগ্রহী করে ভালো ও কল্যাণের কাজে। আগ্রহহীন করে খারাপ ও পাপ কাজে। অন্তরে প্রশান্তি আনে। হৃদয়-বাগিচায় না ফোটা ফুলটাকে প্রস্ফুটিত করে।

১. মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৭৯।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৭; মিশকাত, হা/৫৬৫।

সুরভিত করে তনুমন। এ কথাগুলোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-আনকাবূতে বলেছেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে দূরে রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

এতক্ষণ তাহসান আমার হাত ধরেই চলছিল। এখন পায়ের ব্যথাটা নাই। তাই, ওর হাতটা ছেড়ে দিলাম। ওর কথাগুলো আমার ভালোই লাগছে। শুধু আমি না, যে কেউ ওর কথা শুনে মুগ্ধ হবে। কারণ, সে খুব সুন্দর করে কথা বলতে জানে। হঠাৎ আমি রাস্তার এদিক-ওদিক তাকালাম। একি! গল্পের ঘোরে কখন যে তিন মাথার মোড় পেরিয়ে তাহসানদের বাড়ির অভিমুখে হাঁটা দিয়েছি, বুঝতেই পারিনি। আর কিছুক্ষণ হাঁটলেই তাহসানদের বাড়ি। আমি তাহসানকে বললাম, এই তাহসান! গল্পে গল্পে যে তোর বাড়িতে চলে এলাম। —বাড়িতে আনব বলেই তো মনে করে দেয়নি, তুই আমাদের বাড়ির পথে হাঁটছিস। আম্মু আজ তোকে আনতে বলেছিল। ভাপাপিঠে বানিয়েছে, তাই। আমি আর না করলাম না। এমনিতেও শীতের পিঠা আমার ভালো লাগে। তাছাড়া তাহসানের মা যা পিঠা বানান না! এককথায় 'অসাধারণ'। এই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাহসানকে বলব ভাবতেই তাহসান আমার মনের কথাটাই বলে দিল... —শোন আবির! কিয়ামতের দিন, সেই মুছীবতের সময় আমাদের সর্বপ্রথম কীসের হিসাব নেওয়া হবে জানিস? ছালাতের। যদি এর হিসেব যথাযথ দিতে পারি, তাহলে বাকি পথটা সহজেই পার হতে পারব। আর যদি গরমিল বেঁধে যায়, তাহলে তো কেল্লাফতে। সব শেষ। একারণেই ছালাত দ্বীনের খুঁটি। কেউ যদি ছালাতে উদাসীন হয়, তাহলে তার ঈমানী ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। ছালাত হচ্ছে মুমিনের প্রাণ। ছালাতে মনোযোগী ও যত্নশীল হওয়া মানেই জীবনে আমূল পরিবর্তন আনা। এই ছালাতেই আছে জীবন পরিবর্তনের যাবতীয় উপকরণ। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, শয়তান আমাদের কত রকম কূটকৌশলে ছালাত থেকে দূরে রাখে, তার কোনো ইয়ত্তা নাই। আর আমরাও তার পাতা ফাঁদে আটকা পড়ি। শেষমেষ আমরা জান্নাতের তালা-চাবির একটি দাঁত দুনিয়াতেই ফেলে রেখে চলে যাই সেই পরপারে।

তাহসানের কথাগুলো আমার মনে কাঁটার মতো এসে বিঁধল। সাথে সাথে খুব লজ্জাও পেলাম। কারণ, আজকে ফজরটাই তো আমি পড়িনি। তাহসান আমার মুখ দেখে আমার অনুভূতি বুঝে নিল। বলল... —কীরে! লজ্জা পাচ্ছিস? কথাগুলো কেমন কেমন লাগছে? —তাহসান! আমিতো মাঝেমধ্যেই ছালাত ছেড়ে দেই। —এখন থেকে মিস করবি না। তাহলেই তো

হলো। আর হ্যাঁ! মনে রাখবি, ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবি। ছালাত হলো আল্লাহর সাথে কথা বলার এক সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই বলেছেন,﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*। কোনো বিপদে আছিস? দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহকে বলবি, 'আল্লাহ এই বিপদের পাথরটাকে আমার থেকে সরিয়ে দাও না'। মন খারাপ? মন-সমুদ্রে বইছে কষ্টের ঢেউ! সেই ঢেউ উপচে পড়ছে আঁখিজোড়ার অশ্রু হয়ে। কিছুই ভালো লাগছে না, সব ওলট-পালট লাগছে! দু'রাক'আত ছালাত পড়ে মন খুলে আল্লাহকে সব বলবি, দেখবি! সব ঠিক হয়ে গেছে। অন্তরে প্রশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

জীবনে কিছু হারিয়ে ফেলেছিস? জীবনে কিছুর প্রয়োজন অনুভব করছিস? জীবনটাকে রংধনুর রঙে রাঙাতে চাস? নিভৃতে আল্লাহর সামনে দাঁড়া। সব বলে ফেল প্রিয় রবকে। দেখবি, যা হারিয়েছিস, তার থেকেও বেশি কিছু পেয়ে গেছিস!

যার শূন্যতা ছিল, তা পূর্ণতায় ভরে গেছে। কোনো সিদ্ধান্তে দোদুল্যতায় ভুগছিস? ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহকে বল, দেখবি সঠিক সিদ্ধান্ত মাথায় চলে এসেছে।

মোদ্দাকথা, ছালাতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করবি।

তাহসানদের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। কলিংবেলে চাপ দিতেই দরজা খুলে দিলেন তাহসানের মা। আমাকে দেখে তো তিনি যারপরনাই খুশি। আমরা ফ্রেশ হয়ে বেলকুনিতে এসে বসলাম। আবার গল্প শুরু হলো আমাদের। একটু পর আন্টি পিঠা নিয়ে আসলেন, সাথে দু'কাপ চা। এক কাপ লাল, আরেক কাপ দুধ। আমি বুঝতে পারলাম না, আন্টি কীভাবে জানলেন আমি দুধ চা পছন্দ করি! হয়তো তাহসান বলেছে। আমাকে বসিয়ে রেখে তাহসান রুমের মধ্যে গেল। এখন অনেকটা বেলা হয়েছে। কুয়াশা ছুটি নিয়েছে। প্রকৃতিতে নেমেছে সূর্যিমামার মিষ্টি রোদ। তাহসান রুম থেকে বেরিয়ে এলো। হাতে গিফটপেপারে মোড়ানো একটা বই। আমার হাতে বইটি দিয়ে বলল, 'হাদিয়াতুন লাকা'।

বইটা দেখার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। গিফটপেপারে মোড়ানো আছে বলে দেখা হলো না। শুধু গিফটপেপারের উপরে একটা লেখা দেখতে পেলাম... আমাদের ভালোবাসা সবই যেন হয় মহান রবের জন্য!

'জুমআর দিনের আদব'-প্রবন্ধটির বাকী অংশ

১৬. বেশি বেশি দরূদ পড়া : জুমআর দিন বেশি বেশি দরূদ পড়ার জন্য নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন। আবূ দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّه مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُه حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا 'তোমরা জুমআর দিন আমার ওপর বেশি পরিমাণ করে দরূদ পড়ো। কেননা এ দিনটি হাযিরার দিন। এ দিনে ফেরেশতাগণ হাযির হয়ে থাকেন। যে বক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করে, তার দরূদ আমার কাছে পেশ করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অবসর না হয়'।[২২] *(ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৭; মিশকাত, হা/১৩৬৬, হাদীছ ছহীহ।)*

১৭. বেশি বেশি দু'আ করা : এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعطَاهُ إِيَّاه 'জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, সে মুহূর্তটি যদি কোনো মুমিন বান্দা পায় আর আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন'।[২৩] *(ছহীহ বুখারী, হা/৫২৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫২; তিরমিযী, হা/৪৯১; নাসাঈ, হা/১৪৩১; মিশকাত, হা/১১৫৭।)* অধিকাংশ আলেমের মতে, দু'আ কবুলের সম্ভাবনার সেই সময়টি হলো আছরের ছালাতের পরের সময়। দ্বিপ্রহরের সময়টিতেও দু'আ কবুলের আশা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১৮. জুমআর দিনকে বিশেষ কোনো ছালাত ও ছওমের জন্য নির্দিষ্ট না করা : এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ 'রাত্রিসমূহের মধ্যে জুমআর রাতকে ক্বিয়াম (নফল ছালাত) পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্যে জুমআর দিনকে (নফল) ছিয়াম রাখার জন্য নির্ধারিত করো না। তবে যদি তোমাদের কারও কোনো নফল ছওমের দিন সেই দিনেই পড়ে যায় (তাহলে সে কথা ভিন্ন)'।[২৪] *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪; মিশকাত, হা/২০৫২।)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জুমআর দিনের উক্ত আদবগুলো যথাযথভাবে পালন করার তওফীক্ব দান করুন এবং এর মাধ্যমে অশেষ ছওয়াবের অধিকারী করুন— আমীন!

এক বৃদ্ধ বাদামওয়ালার গল্প

-সাদিয়া আফরোজ*

দবির উদ্দিন এক বৃদ্ধ বাদামওয়ালা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কখনো বাদ যায় না তার। পরিচিতজনদের কাছে তিনি একজন ঈমানদার দ্বীনদার ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত। ভারী কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না। সেই শক্তিও নেই শরীরে। তাই স্কুল-কলেজে বাদাম বিক্রি করে জীবিকার যোগান দিতে হয় তাকে।

একদিন কলেজের এক ছাত্র তার সাথে কথা বলে। সেই ছাত্র তাকে অনেক দিন ধরে কলেজে বাদাম বিক্রি করতে দেখছে। তাই সে জানার কৌতূহল থেকে তাকে প্রশ্ন করে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে দাদু বলে ডাকত।

—আস-সালামু আলাইকুম। দাদু, কেমন আছো? দাদিমা কেমন আছে? —ওয়ালাইকুম আস-সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আছি, আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ভালো রাখছেন। তোমার দাদিমাও আল-হামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আল্লাহ যেমন রেখেছে তাতেই আমরা খুশি। সে প্রশ্ন করে- দাদু, তুমি প্রতিদিন বাদাম বিক্রি করে কত টাকা পাও? সেটা দিয়ে কি তোমার সংসার চলে?

—পাই দাদু যা আসে তাতেই আমার ছোট সংসার চলে যায় আল-হামদুলিল্লাহ। ছাত্রটি বলে, তুমি চাইলে তো ভিক্ষা করতে পারতে? —না রে দাদু! ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষেত্রবিশেষে হালাল হলেও অনুত্তম কাজ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম’।[১] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, ‘কষ্ট করে পিঠে বোঝা বহন করে জীবনযাপন করা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অনেক উত্তম’।[২] এটাই আমার নবীর আদর্শ। আর আমি তাঁর আর্দশে বিশ্বাসী। তাই ভিক্ষা করতে আমার বিবেকে বাধে, ভালো লাগে না। এজন্য ভিক্ষা না করে বাদাম বিক্রি করি। হালাল রূযী রোজগার করি। —কিন্তু দাদু অনেকেই তো দেখি আমাদের কলেজে এসে বা রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করে!

—তাদের মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়া একটা বদ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মানুষগুলো চাইলে আমার মতো কম পুঁজির কম পরিশ্রমের এই বাদামের ব্যবসা করতে পারেন। কিন্তু তারা তা না করে ভিক্ষা করে। একদিন অন্য এক বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলি, আপনি ভিক্ষা করেন কেন? আমার মতো বাদাম বিক্রি করতে পারেন না? লোকটি কোনো কথা না বলে চলে যান।

—আচ্ছা দাদু, তোমার কোনো ছেলে-মেয়ে নেই? তারা তোমাদের খোঁজ-খবর কিছু নেয় না। —আছে, থাকবে না কেন? কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা ভালো না। নিজরাই ভালোভাবে চলতে পারে না। তাই আমি তাদের কোনো চাপ দিই না। তবে মাঝেমধ্যে ছেলেরাও খোঁজ-খবর নেয়, টাকাপয়সা কিছু হাতে দেয়। আবার বাজার-সদাইও করে দেয়। এতেই আমরা খুশি। —আচ্ছা দাদু, ঠিক আছে, ক্লাস শুরু হবে। আজ তবে যাই পরে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। এই বলে ছাত্রটি ক্লাসে চলে যায়। এরপর দবির উদ্দিন কলেজে বাদাম বিক্রি করে স্কুলে চলে আসেন। —দবির উদ্দিন, বাদাম দাও। তোমার হাতের বাদাম না খেলে ভালো লাগে না। কেমন আছো? দিনকাল কেমন যাচ্ছে? বাদাম দিতে দিতে জি, স্যার! আল-হামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের সকলের দু‘আয় দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। দবির উদ্দিন সারাদিন স্কুল-কলেজে বাদাম বিক্রি করে আবার মাগরিবের ছালাত পড়ে সন্ধ্যার পর বাজারে বাদাম বিক্রি করতে যায়। এলাকায় তিনি বাদামওয়ালা হিসাবেই পরিচিত। সবার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। রাতে বাজার থেকে ফেরার পথে আবার নতুন বাদাম কিনে এর সাথে খাবারের বাজার নিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরেন। এরপর এশার ছালাত পড়ে স্ত্রীসহ আল্লাহর দেওয়া রিযিক্ব খেয়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েন। এভাবে কাটে দবির উদ্দিনের জীবনের প্রতিটি দিন।

বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল। হঠাৎ করে দবির উদ্দিন স্কুল-কলেজে কোথাও বাদাম বিক্রি করছে না। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা দবির উদ্দিনকে ভালোবাসত। তারা চিন্তা করছিল দবির উদ্দিনের কিছু হয়েছে কি না! এক ছাত্র দবির উদ্দিনের বাড়ি যায় তার খোঁজ-খবর নিতে।

খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে দবির উদ্দিনের স্ত্রী খুব অসুস্থ। তাকে নিয়ে কয়েক দিন থেকে তিনি হাসপাতালে আছেন। স্ত্রীর অপারেশন করাতে হবে। এজন্য তার অনেক টাকার প্রয়োজন। তার ছেলে-মেয়েরাও কিছু কিছু করে টাকা দিয়েছে। কিন্তু তার আরও টাকা প্রয়োজন।

তখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকরাসহ টাকা তুলে দবির উদ্দিনের হাতে তুলে দিয়ে বলে, স্ত্রীর চিকিৎসা ভালো করে করাও। আমরাও দু‘আ করি আল্লাহ তাকে দ্রুত সুস্থ করে দিন। চিন্তা করো না। আরও টাকা লাগলে আবারও ফান্ড কালেকশন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষকদের হাত থেকে টাকা ও দু‘আ পেয়ে খুশিতে দবির উদ্দিন কেঁদে ফেলে। আর আল-হামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া জানান।

তিনি মনে মনে ভাবেন, আমি যদি আজ ভিক্ষা করে সংসার চালাতাম তাহলে হয়তো এই মানুষগুলো আজ আমার মহা বিপদে টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করত না। ভিক্ষুককে মানুষ সাধারণত করুণা করে; সম্মান ও ভালোবাসে না। আর পরিশ্রমীকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে। ন্যায়নিষ্ঠাবান হলে বিপদে এভাবেই পাশে থাকে। আল্লাহর শুকরিয়া করে তিনি বলেন, ভিক্ষা না করে বাদামের এই ছোট ব্যবসা করার কারণে আজ মানুষের এত ভালোবাসা ও সম্মান পেলাম। তার স্ত্রী সুস্থ হলে তিনি পুনরায় বাদাম নিয়ে স্কুল-কলেজে বিক্রি করতে যান।

* হাজীর হাট কাঁটাবাড়ি মিলবাজার, রংপুর সদর, রংপুর।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৭।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৭১।

রবের যিকির

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
আলিম ২য় বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদরাসা,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

রবের যিকির করে সবে
ফুল-পাখি আর গাছ,
সাগর-নদী, তরু-লতা
গভীর জলের মাছ।
রবের যিকির সবার কাছে
খুব প্রিয় এক কাজ,
অশান্ত মন শান্ত করে
দেয় যে খুশির সাজ।
আল্লাহর নামে যিকির ধ্বনি
বাজে প্রতিক্ষণ,
কাজের মাঝে রবের যিকির
ভরিয়ে দেয় যে মন।
আল্লাহ ছাড়া নেই যে ইলাহ
আল্লাহ হলেন এক,
রবের যিকির করে সবে
কামাও বেশি নেক।

মা-বাবা

-আব্দুল বারী
নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

মা-বাবাহীন জীবন কেমন, হারালে তবে বুঝবে,
এদিক-সেদিক চারিদিকে শুধু মা-বাবাকেই খুঁজবে।
মা-বাবা ছাড়া শূন্য আকাশ সারাটা ঘর ফাঁকা,
সকাল-সাঁঝে মনটা কাঁদে তাদের ছবি আঁকা।
হাত বুলিয়ে মাথার পরে দেয় না কেউ আর দু'আ,
চোখের জলে কি তাদের স্মৃতি যায় কখনো ধোয়া?
জান্নাত-জাহান্নাম তাদের সেবায় জেনে রেখো ভাই,
কুরআন-হাদীছ পড়ে-শুনে জেনেছি মোরা তাই।
মা-বাবা যদি দুনিয়া ছাড়ে দু'চোখ ভরা জলে,
আল্লাহ তাআলা দেবেন আযাবের অতল তলে।
মা-বাবার তাই সেবা করো দিয়ে সবাই মন,
পৃথিবীতে মোরা জান্নাত কিনব এই করি পণ।

এখনও কি হয়নি সময়?

-আবুল হাশেম
অনার্স, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্স, ঢাকা।

ওহে মুসলিম! জাগো তুমি
ঘুমিয়ো না আর,
এখনও কি হয়নি সময়
তোমার জেগে উঠার?
তুমি কি দেখ না যালেমের দল
কীভাবে হুংকার দিচ্ছে বারেবার,
দিনে দিনে বেড়েই চলেছে
ওদের অত্যাচার।
আর কতকাল সইবে তুমি
নীরবে অত্যাচার,
এখনও কি হয়নি সময়
তোমার জেগে উঠার?
বীরের জাতি হয়েও তুমি
মার খাও বারবার,
কাপুরুষের চাদর পরে
আর রইবে কত কাল?
ভুলে কি গেছ তুমি
তোমার অতীত ইতিহাস?
বীরের বেশে খালেদ তুমি
উমারের হুংকার।

প্রিয় রাসূল

-সানাউল্লাহ আদ-দিলবারী
ছানাবিয়্যাহ ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া,
উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

জন্ম নিলে সুদূর দেশে
করলে বিশ্বজয়,
ছড়িয়ে দিলে সত্যের বাণী
করলে না কারও ভয়।
প্রভুর আদেশ পালনে তুমি
সহ্য করেছ যাতনা,
কারও প্রতি নাহি ছিল
তোমারি কোনো বেদনা।
সাম্য আর সৌহার্দ দিয়ে
করেছো বিশ্বজয়,
বাতিল কুফফার নত করেছে শির
হয়েছে পরাজয়।
ধন্য হলো তোমারে পেয়ে
সুন্দর এ বসুন্ধরা।
তোমার বিদায়ে সকলে
হয়েছে যে প্রিয়হারা।

বাংলাদেশ সংবাদ

পার্বত্যাঞ্চলে খ্রিষ্টানকরণ বেড়েই চলেছে

৩০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯১ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিষ্টান ধর্মান্তকরণের হার সর্বাধিক। খ্রিষ্টান মিশনারি, খ্রিষ্টান চ্যারিটি, এনজিও'র সংখ্যা ও তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি পার্বত্য-উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই নয় বাংলাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী সমতল-উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও খ্রিষ্টানকরণ দ্রুতগতিতে চলছে। সম্প্রতি পরিচালিত কিছু গবেষণা ও প্রতিবেদনে পার্বত্যাঞ্চলে ধর্মীয় রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। সাধারণভাবে একটি ঢালাও প্রোপাগান্ডা চালানো হয় যে, পাহাড়ে ইসলামীকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব তথ্যে এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক ও অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিচুক্তির আগে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে মুসলিমদের মসজিদ ছিল ৭৫৬টি। হিন্দুদের মন্দির ছিল ২৭০টি। বৌদ্ধদের কিয়াং ছিল ১১১৯টি এবং খ্রিষ্টানদের গির্জা ছিল ২৭৪টি। কিন্তু শান্তিচুক্তির পর এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য-পরিসংখ্যানগত বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন মসজিদ নির্মিত হয়েছে ৬৭৫টি, মন্দির ১৭৬টি, কিয়াং ৫৪১টি এবং গির্জা ৪৪০টি। এসব তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্তমানে পার্বত্যাঞ্চলে সর্বমোট মসজিদের সংখ্যা ১৪৩৪টি, মন্দির ৪৪৬টি, কিয়াং ১৬৬০টি এবং গির্জা রয়েছে ৭১৪টি। অর্থাৎ শান্তিচুক্তির পর মসজিদ, মন্দির, কিয়াং মোটামুটিভাবে সংখ্যাগত দিক থেকে দ্বিগুণ হলেও গির্জার বৃদ্ধি হয়েছে চারগুণ। স্পষ্টভাবে গির্জার সংখ্যা বৃদ্ধির হার পার্বত্যাঞ্চলে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির তথ্যকে প্রমাণ করে, যা সেখানে 'ইসলামীকরণ' এর প্রচারণাকে মিথ্যা এবং 'খ্রিষ্টানকরণ' এর তথ্যকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। গবেষণাকালে আরও জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চাকমা, মারমা, বম, খুমি, চাক এবং হিন্দু ত্রিপুরাদের অনেকেই স্বধর্ম ছেড়ে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। একটি তথ্যানুযায়ী, শান্তিচুক্তির পর ১৯৯৮ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪৩৪৪ জন খ্রিষ্টান হয়েছে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম হতে। অপর দিকে মাত্র ৪৫০ জন হয়েছে মুসলিম। হিন্দু হয়েছে ৭৬ জন।

দেশে বছরে প্রায় ২ লাখ মানুষ পরিবেশ দূষণে মারা যায়

বায়ুদূষণ মানুষের এক নীরব ঘাতক। ২০ বছরে বায়ুদুষণজনিত রোগ-বালাইয়ের কারণে মৃত্যু ৯ শতাংশ বেড়েছে। বায়ুদূষণে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে প্রায় দুই লাখ মানুষ। ১৫ বছরে প্লাস্টিক দূষণও বেড়েছে দ্বিগুণ। বেশ কয়েকটি গবেষণায় জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার ফলে মানুষের হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের সংক্রমণ ও ক্যান্সার হওয়ার শঙ্কা বৃদ্ধি পায়। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (WHO) মতে, বায়ুদূষণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন, স্ট্রোক, হৃদরোগ, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ৭০ লাখ মানুষ মারা যায়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, দূষিত বায়ুর কারণে ২০১৯ সালে রাজধানী ঢাকায় ২২ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বায়ুদূষণের কারণে মানুষের গড় আয়ু তিন বছর কমেছে। বায়ুদূষণের পাশাপাশি প্লাস্টিক দূষণও মহামারি আকার ধারণ করেছে। এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ESDO) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লাখ ৯২ হাজার ১০৪ টন পরিমাণ প্লাস্টিকের স্যাশে বা মিনিপ্যাক-বর্জ্য উৎপাদিত হয়। মানুষ দিনে প্রায় ১২ কোটি ৯০ লাখ প্লাস্টিকের স্যাশে ব্যবহার করে। ২০২১ সালের ২১ জুন থেকে ২০২২ সালের ২২ মে দেশে প্রায় ১০ লাখ ৬ হাজার টন ওয়ানটাইম বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বর্জ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্লাস্টিকের মিনি প্যাকেট পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। প্লাস্টিকের মিনি প্যাকেট আকারে ছোট হলেও পরিবেশে এর প্রভাব বিশাল।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কমেছে খ্রিষ্টান, বেড়েছে মুসলিম

ব্রিটেন এবং ওয়েলসে ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা। ব্রিটেনের আদমশুমারির তথ্যে বহুসংস্কৃতির দেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রথমবারের মতো মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগেরও কম অর্থাৎ অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা। অন্যদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলিম ও হিন্দুদের সংখ্যা। সেনসাস ২০২১-এ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের শতকরা ৪৬.২ ভাগ মানুষ অর্থাৎ ২ কোটি ৭৫ লাখ মানুষ নিজেদেরকে খ্রিষ্টান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ২০১১ সালে এই হার ছিল শতকরা ৫৯.৩ ভাগ বা ৩ কোটি ৩৩ লাখ। অর্থাৎ এ সময়ে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৩.১ ভাগ। অন্যদিকে মুসলিমদের সংখ্যা ২০১১ সালে ছিল শতকরা ৪.৯ ভাগ। ১০ বছর সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫ ভাগ। অর্থাৎ

২০১১ সালে মুসলিমদের মোট সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ আর ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে তা বর্তমানে হয়েছে ৩৯ লাখ।

বিশ্বের জনসংখ্যা এখন ৮০০ কোটি

বিশ্বের জনসংখ্যা এখন ৮ বিলিয়ন (৮০০ কোটি)! জাতিসংঘ বলছে, সাত বিলিয়নের মাইলফলক অতিক্রম করার মাত্র ১১ বছরের মধ্যেই আট বিলিয়নে পৌঁছে গেল বিশ্বের জনসংখ্যা। মূলত ২০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত বাড়তে থাকে জনসংখ্যা। কিন্তু এখন সেই গতিতে ভাটা পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন ধীরে ধীরে কমবে। ফলে জনসংখ্যা নয় বিলিয়নে পৌঁছাতে ১৫ বছর লেগে যাবে। আর ১০ বিলিয়নে পৌঁছাতে অপেক্ষা করতে হবে ২০৮০ সাল পর্যন্ত। গত ৩৫ বছরে বিশ্বে ৩ বিলিয়ন মানুষ বেড়েছে। কিন্তু আগামী ৩৫ বছরে বাড়বে মাত্র ২ বিলিয়ন এবং এক পর্যায়ে এই বৃদ্ধি থেমে যাবে।

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনে রোবটিক বন্দুক মোতায়েন করেছে ইসরাঈল

ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে রোবটিক (স্বয়ংক্রিয়) অস্ত্র মোতায়েন করেছে ইসরাঈল। সম্প্রতি ফিলিস্তীনীদের সঙ্গে প্রবল উত্তেজনার মধ্যেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া খ্যাত দখলদার এই দেশটি। এই রোবটিক অস্ত্র গুলি ছোড়ার পাশাপাশি টিয়ার গ্যাস এবং স্টান গ্রেনেডও ছুড়তে পারে। ইসরাঈলীরা চাইলে এখন দূরে বসেই ফিলিস্তীনীদের টার্গেট করে হামলা চালাতে পারবে এই অস্ত্র দিয়ে। হেবরন শহর এবং আল-আরব শরণার্থী শিবিরের সামনে এই অস্ত্র মোতায়েন করেছে ইসরাঈল। এই রোবটিক অস্ত্র ইসরাঈলী নযরদারি টাওয়ারগুলোর উপরে মোতায়েন করা হয়েছে। এই টাওয়ারে যে শক্তিশালী নযরদারি ক্যামেরা আছে তার সঙ্গে যুক্ত এই রোবটিক অস্ত্র। এর নিজস্ব ক্যামেরা ও সেন্সরও রয়েছে। ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (IDF) দূরে বসেই নির্দিষ্ট টার্গেটে হামলা চালাতে পারবে। এছাড়া এই অস্ত্রগুলো নিজে থেকেই টার্গেট বাছাই করে গুলি ছুড়তে পারে। সম্প্রতি ফিলিস্তীনের অভ্যন্তরে একাধিক অভিযান পরিচালনা করে ইসরাঈল। এতে বহু ফিলিস্তীনী নিহত হয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত আছে। যেই দুই এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংঘাত দেখা গেছে, মূলত সেখানেই নতুন এই অস্ত্র মোতায়েন করেছে ইসরাঈল। ফলে কোনো ফিলিস্তীনী গোষ্ঠী বা সংগঠন যদি ইসরাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামে, এই অস্ত্র থেকে অনবরত টিয়ার গ্যাস এবং বুলেট বেরোতে থাকবে। কারো পক্ষে রাস্তায় দাঁড়ানোরই সুযোগ হবে না।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

পাওয়ার পাথ : এবার হাঁটলেই তৈরি হবে বিদ্যুৎ

বেশ কয়েকমাস ধরেই বিদ্যুৎ নিয়ে বেশ হইচই চলছে। লোডশেডিংয়ের মাত্রাও অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ ছাড়া জীবন বর্তমান যুগে ভাবাই যায় না। চাহিদা বাড়তে থাকা এবং জ্বালানি সংকটের কারণে দেশে বিদ্যুতের অভাব দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে জ্বালানির ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের অভাব আরও বাড়বে, এমন আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরকম পরিস্থিতিতে মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এসেছে ব্রিটেনের একটি শহর। মজাদার উপায়ে সাধারণ মানুষই সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন। তাও কোনো খরচ ছাড়াই। ব্রিটেনের টেলফোর্ড শহর এই কাজটি করে দেখিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কী করতে হবে? কিছুই না, শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাঁটতে হবে। তাহলেই হয়ে গেল। মানুষের পায়ের চাপেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে যাবে। আপাতত মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য উৎপাদিত এই বিদ্যুৎ কাজে লাগানো হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিসরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। জানা গেছে, প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটি রাস্তা বানানো হয়েছে। যখনই কেউ ওই নির্দিষ্ট রাস্তায় চলাফেরা করছেন, তাদের পায়ের চাপেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। একজন ব্যক্তি হেঁটে কতটা বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারলেন, তার হিসাবও দেখা যাবে। পাওয়ার পাথ নামে এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছে যে সংস্থা, তারা চায় এই প্রকল্প যেন আরও বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে শুধু ব্রিটেন নয়, দুবাই ও হংকংয়ের কিছু জায়গাতেও এই পাওয়ার পাথ তৈরি করা হয়েছে।

নীল তিমি দিনে ৪৫ কেজি প্লাস্টিক খায়

বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণি নীল তিমি। এগুলোর খাবার খাওয়ার ধরনও এমন বিশালই। প্রতিদিনই প্রাণীটি গলাধঃকরণ করে টন টন খাবার। তাদের প্রধান খাবার হলো চিংড়ি সদৃশ্য কিরিল (Krill)। তাছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণীও খেয়ে থাকে তারা। তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নীল তিমি এখন প্লাস্টিকও খাচ্ছে। সাগরে প্লাস্টিকের ছোট ছোট দানায় ভরপুর হয়ে যাওয়ার কারণেই এমনটি হচ্ছে। গবেষণা থেকে যে ভয়ংকর তথ্য পাওয়া গেছে সেটি হলো নীল তিমি দিনে ৪৫ কেজির মতো প্লাস্টিক খায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক উপকূলে বেলিন জাতের তিমি নীল, ফিন ও হাম্পব্যাক এ তিন প্রজাতির ওপর গবেষণা চালিয়ে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : জনৈক ব্যক্তি একটি ঘরে বসবাস শুরু করার পর থেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় বড় কয়েকটি মুছীবতে, যার কারণে সে এই ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গলের কারণ হিসাবে মনে করছে। তার জন্য কি ঘর ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে?

-মুহাম্মাদ বিল্লাহ
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো ব্যক্তির উপর কখনো কোনো বিপদ/মুছীবত আসে না। আল্লাহ বিভিন্ন সময় অনেক রকমের মুছীবত দ্বারা মুমিন বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ’ (আত-তাগাবূন, ৬৪/১১)।তিনি আরো বলেন, ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী’। (আল-বাকারা, ২/১৫৫-৫৬)। আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিপদাপদ, বালা-মুছীবত একমাত্র আল্লাহর আদেশে এসে থাকে। আর এটি বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা। কোনো বাড়ি, গাড়ি, নারী ইত্যাদির মাঝে অমঙ্গল, অকল্যাণ নেই। সায়েদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু উখতে নামির থেকে মারফূ‘সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সংক্রামক ব্যধি বলতে কিছু নেই, ছফর মাসে অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচার ডাকে কোনো অশুভ লক্ষণ নেই’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯১৯)। সুতরাং এ ঘরে বসবাস করার জন্য মুছীবতে পতিত হয়েছি এমনটি মনে করে ঘর ছাড়া যাবে না। কেননা এতে আক্বীদায় ত্রুটি হবে। তবে, সূরা বাক্বারা বা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়লে জিন ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রশ্ন (২) : অনেকে কোনো বিপদে কিংবা কষ্টের মধ্যে পতিত হলে বলে থাকে যে, ‘আমার তাক্বদীর ভালো আছে, শুধু সময়টা খারাপ যাচ্ছে’ এরূপ কথা বলা যাবে কি?

-মুহাম্মদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: এরূপ কথা বলা যাবে না। কেননা, যার তাক্বদীরে যা লিখা আছে তা তার জীবনে ঘটবেই। ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের একটি রুকন। তা প্রতিহত করার কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর তোমার জীবনে যা কিছু হাত ছাড়া হয়েছে তা তোমাদের জীবনে ঘটবার ছিল না’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৬৫১)। অতএব জীবনে যত বিপদাপদ আসবে তার জন্য বিচলিত না হয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আর ঘাবড়ে গিয়ে সময়কে গালমন্দ করা যাবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা সময়কে গালমন্দ করো না। কেননা, আমিই সময় (তথা আমি সময়ের মালিক, আমি সময় পরিচালনা করি), আমি রাত ও দিন পরিবর্তন করি, (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৪৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯১২৬)।

প্রশ্ন (৩) : বর্তমানে ফেসবুক টুইটারসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও দেখা যাচ্ছে। যেখানে পাঁচ তারকা বা পাক-পাঞ্জাতন নামে একটি টুপি দেখানো হচ্ছে আর বলা হচ্ছে- সমস্ত ইসলামকে টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে অন্যান্য ফযীলতের কথা বলা হচ্ছে। বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

-মো. নোমান
রাজশাহী।

উত্তর: পাক-পাঞ্জাতন একটি ফারসী শব্দ। যার অর্থ পাঁচজন পবিত্র ব্যক্তি। এ শব্দটি ভ্রান্ত দল শিয়াদের আবিস্কৃত শব্দ। কুরআন হাদীছে এমন শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে মাজারপূজারী ভণ্ডরা একটি টুপি আবিস্কার করেছে। যার নাম দিয়েছে পাঁচ-তারকা টুপি। যে টুপির একপ্রান্তে একটি চাঁদ আছে আর চাঁদের সম্মুখে চারটি তারকা রয়েছে। তারা বুঝাতে চায়ছে যে, চাঁদটি হলো নবী, আর তারকাগুলো পর্যায়ক্রমে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম। তারা বিভিন্ন বক্তব্যে এই টুপি কেনার জন্য মানুষকে উদবুদ্ধ করছে। এমন কোনো টুপির নকশা রাসূল, ছাহাবী, তাবেঈ থেকে পূর্বের কোনো বিদ্বান থেকে পাওয়া যায় না। বরং এটি নিছক নবউদ্ভাবিত একটি বিষয়। যার মাধ্যমে সুকৌশলে মানুষের মাঝে ভ্রান্ত শিয়া আক্বীদার প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে। মানুষকে ঈমান হারা করা হচ্ছে। সুতরাং এমন টুপি ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

প্রশ্ন (৪) : ফেসবুকে লাল-গাভী নিয়ে খুব পোস্ট করা হচ্ছে। এটা নাকি দাজ্জাল আগমনের আলামত। এ কথার সত্যতা কতটুকু?

-আফীফ রহমান
ঝালোকাঠি।

উত্তর: ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যমতে, কিয়ামতের পূর্বে একটি লাল-গাভীর জন্ম হবে। গাভীটির বয়স ৩ বছর হলে ইয়াহুদীরা সেই গাভীকে আগুনে জ্বালিয়ে সেই ছাই মেখে নিজেদেরকে পবিত্র করবে। অন্যথায় তারা পবিত্র হতে পারবে না। তাদের দাবী সে গাভী নাকি আমেরিকার একটি গো খামারে পাওয়া গেছে। তবে, ইসলামে একথার কোনো ভিত্তি নেই। কিয়ামতের পূর্বে এমন কোনো আলামত কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়নি। অতএব এসব দাবী ও ঘটনা মিথ্যা ও বানোয়াট।

পবিত্রতার বিধান

প্রশ্ন (৫) : ওযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করার সময় পরবর্তী অঙ্গ পূর্বে ধৌত করলে, পুনরায় নতুন করে ওযূ করতে হবে কি? যেমন হাত না ধৌত করে আগে পা ধৌত করা।

-তামিম আল-আমিন
টঙ্গি, গাজীপুর।

উত্তর: ওযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তাআলা ওযূর অঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন (ছালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পাগুলিকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল... (আল-মায়েদা, ৫/৬)। হাদীছ দ্বারাও ওযূর অঙ্গ ধৌত করার ধারাবাহিকতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যতো সংখ্যক ছাহাবী ওযূর হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো ছাহাবী ওযূর ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেননি। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেছেন এ মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ওযূর ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে ওযূ বাতিল হবে। এমন ওযূ দ্বারা ছালাত আদায় করে থাকলে, সে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে।

প্রশ্ন (৬) : মনে হচ্ছে স্ত্রীর হায়েয শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি সহবাস করার পর আবার রক্ত বা হায়েয দেখা যায়, তাহলে করণীয় কী?

-না প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: ঋতুর নির্ধারিত সময় যা সাধারণত প্রথমবার ঋতুর পর ঘটে থাকে, তা থেকে পবিত্র হওয়ার দু'একদিন পর যদি আবার রক্ত দেখা যায়, তাহলে সেটা রোগজনিত কিংবা বাতিল রক্ত। হায়েযের রক্ত নয়। তাই এই রক্ত ধুয়ে ফেলে ছালাত, ছিয়াম, বায়তুল্লাহর তওয়াফ, স্ত্রী সহবাসসহ সকল কাজ করতে পারবে (লাজনা দায়েমা, ৫/৩৮৮)। তবে, স্বাভাবিক সময় পার না হওয়ার আগে স্ত্রী সহবাস করে থাকলে, কাফফারা দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করে, তাহলে সে যেনো অর্ধ দ্বীনার ছাদাক্বা করে' (তিরমিযী, হা/১৩৬; ইবনু মাজাহ, হা/৬৪০)। সুতরাং এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

ছালাত

প্রশ্ন (৭) : ছালাতের জন্য কখন আযান দিতে হবে? ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেও নাকি আযান দিলে তা যথেষ্ট হবে?

-আবূ তাহের
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর: ছালাতের সময় হলে আযান দিতে হবে। সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না। কেননা ছালাতের সময় যেমন নির্ধারিত তদ্রূপ আযানের সময়ও নির্ধারিত। যদি কেউ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আযান দেয় তাহলে সে আযান যথেষ্ট হবে না। বরং পুনরায় আযান দিতে হবে (আল মাজমূ' লিন-নববী, ৩/৮৯; আল-মুগনী, ১/২৯৭)। মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে এবং তার সাথীদেরকে বললেন, 'যখন ছালাতের সময় হবে তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৮১৮)। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, সময় হলে আযান দিতে হবে। সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৮) : দুই সিজদার মাঝখানে যে দুআ পড়া হয়, সেটি ওয়াজিব, না-কি সুন্নাত?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: দুই সিজদার মাঝে হাদীছে বর্ণিত দুআটি পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝে বলতেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي 'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন' (তিরমিযী, হা/২৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৪৫)। অন্য বর্ণনায় দুআটি এইভাবে রয়েছে رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي (ইবনু মাজাহ, হা/৮৯৮)।

প্রশ্ন (৯) : দুই সিজদার মাঝখানের দুআ পড়েছি কি পড়িনি এরূপ সন্দেহ হলে অথবা পড়তে ভুলে গেলে করণীয় কী, সাহু সিজদা দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: দুই সিজদার মাঝের দুআ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম থেকে শুরু করে পরবর্তী ইমামগণ পাঠ করতেন। তাই গুরুত্ব সহকারে এই দুআ পাঠ করা উচিত। তবে

কারণবসতঃ পড়তে না পারলে কিংবা ভুলবসতঃ ছুটে গেলে সাহু সিজদা লাগবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেসকল কারণে সাহু সিজদা করেছেন এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণত যে কারণে সাহু সিজদা দিতে হয় তা হচ্ছে- ১. ছালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাম ফেরালে ২. তাশাহহুদ ছুটে গেলে ৩. রাকআতে কম-বেশি হলে ৪. ছালাতের মাঝে সন্দেহ হলে (যাদুল মা'আদ, ১/১৬৯ পৃ.)।

প্রশ্ন (১০) : আমি যে এলাকায় থাকি সে এলাকার অধিকাংশ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদের মসজিদে শুক্রবারে আযানের অনেক পর জুমআর খুতবা শুরু হয়। প্রশ্ন হলো- শুক্রবারে মসজিদে আগে যাবার যে ফযীলত, হানাফী মসজিদে কোন সময় গেলে আমি তা অর্জন করতে পারব?

-সুমন আহমেদ
হলুদ ঘর, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর: বিশুদ্ধ হাদীছে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যারা সকাল সকাল মসজিদে গমন করে তাদের জন্য কুরবানীর নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে। (ছহীহ বুখারী, হা/৯২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০; মিশকাত, হা/১৩৮৪)। তবে উক্ত বর্ণনায় সে সময়টি কখন থেকে শুরু আর কোন সময় থেকে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কে কী কুরবানী করার নেকী পাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে উক্ত বর্ণনায় সময়ের নির্দিষ্ট ভাগ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং প্রথম সময়ের মধ্যে যতজন প্রবেশ করবে, সবাই উট কুরবানীর ছওয়াবের অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সময়ে যতজন প্রবেশ করবে, সবাই গরু কুরবানীর ছওয়াবের অধিকারী হবে। অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে একই কথা। তবে এই সময়টা কীভাবে নির্ধারিত হবে, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল, সূর্যোদয় থেকে শুরু করে আযান পর্যন্ত এই সময়টুকুকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে যা হয়, তার প্রথম ভাগ হবে প্রথম সময়, দ্বিতীয় ভাগ হবে দ্বিতীয় সময়। এভাবে চলতে থাকবে (মাজমূঊ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল লি-ইবন উছায়মীন, ১৬/১৪০ পৃ.)। সুতরাং কেউ যদি সময় মতো মসজিদে যায় তাহলে সে এ ফযীলত পাবে যদিও তা হানাফী মসজিদ হয়।

প্রশ্ন (১১) : ছালাতের প্রথম বৈঠকে ভুলে দরূদ ও দুআ মাসূরা পাঠ করলে কি সাহু সিজদা দিতে হবে?

-অভি সরদার
ঈশ্বরদী-পাবনা।

উত্তর: সাধারণত যে কারণে সাহু সিজদা দিতে তা হচ্ছে- ১. ছালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাম ফেরালে (অর্থাৎ কোনো কিছু ছুটে গেলে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৮)। ২. তাশাহহুদ ছুটে গেলে (ছহীহ বুখারী, হা/৭৯৫) ৩. ছালাত কম-বেশি হলে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৮) ৪. ছালাতের মাঝে প্রবল ধারণামূলক সন্দেহ হলে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯২; যাদুল মা'আদ, ১/১৬৯ পৃ.; মাজমূঊ' ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, ১৪/১পৃ.)। সুতরাং কেউ যদি ভুলে প্রথম বৈঠকে দরূদ, দুআ মাসূরা পাঠ করে ফেলে তাহলে তাকে এর জন্য সাহু সিজদা দিতে হবে না। উল্লেখ্য যে, প্রথম বৈঠকে দরূদ পাঠের বর্ণনাও হাদীছে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (১২) : টি শার্ট পরে ছালাত পড়া মাকরূহ অনুরূপ গুল খাওয়া, বিড়ি খাওয়া। আসলে মাকরূহ শব্দের অর্থ কি? আল-কুরআনে কিংবা ছহীহ হাদীছে এমন শব্দ আছে কি?

-বদরুদ্দোজা
কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: প্রথমত: টি শার্ট/গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা মাকরূহ নয়। যদিও গলদেশের কিছু অংশ বের হয়ে থাকে। তবে এমন কোনো কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে না, যা পরিধান করলে কাঁধ খোলা থাকে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে তোমাদের কেউ যেন ছালাত আদায় না করে'। আর তিনি নিজেও এক কাপড়ে ছালাত আদায় করার সময় তা শরীরে এমনভাবে জড়িয়ে নিতেন যে, কাপড়ের দুই দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর থাকত' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫১৭; মিশকাত, হা/৭৫৪)। দ্বিতীয়ত: গুল, তামাক, বিড়ি খাওয়াও মাকরূহ নয় বরং তা স্পষ্ট হারাম। কেননা এসব নেশাদার দ্রব্য। আর সকল প্রকারের নেশাদার দ্রব্য হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম' (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৮৭; মিশকাত, হা/৩৬৫২)। উল্লেখ্য যে, মাকরূহ শব্দটি কুরআন ও হাদীছে একেক স্থানে একেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আবার কখনো অপছন্দনীয়, মন্দ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা আল-ইসরা ৩৮ নং আয়াতে হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অধিকাংশ সময় হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ 'ইবনুল ক্বায়্যিম' ৪/৬ পৃ.)।

প্রশ্ন (১৩) : আমরা জানি যে, দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু জনৈক আলেমকে এক সম্মেলনে বসে খুতবা দিতে দেখলাম। এটা শরীআতসম্মত কি?

-নাজমুল ইসলাম
জামতলা, শার্শা, যশোর।

উত্তর: দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে। বসে খুতবা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। মাঝে বসে দুই খুতবার মাঝে পার্থক্য করতেন। জুমআর সম্পূর্ণ খুতবা তিনি কখনো বসে দেননি। জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন এরপর বসতেন। এরপর আবার দাঁড়িয়ে

খুতবা দিতেন। অতএব যে তোমাকে সংবাদ দিবে যে, তিনি বসে খুতবা দিতেন সে মিথ্যা বলেছে (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬২)। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমার ও উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহুম তাঁরা সবাই জুমআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এমনকি উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তিনি (কিছু সময়) বসার পর আবারো দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু প্রথম খুতবা বসে দিতেন এবং দ্বিতীয় খুতবা দাঁড়িয়ে। এই হাদীছ থেকে সম্পূর্ণ খুতবা বসে দেওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অপারগতা জনিত কারণে কিছুক্ষণ বসেছেন এমনটি বুঝা যায়। (ফাতহুল বারী লি ইবনি হাজার, ২/৪০১)। সুতরাং দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে এটিই বিধিবদ্ধ সুন্নাত। ছহীহ হাদীছের সামনে এমন অজুহাত চলে না।

প্রশ্ন (১৪) : কেউ যদি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা'র ছালাত যথা সময়ে জামা'আতে আদায় করে। কিন্তু ফজরের ছালাতে নিয়মিত জামাআত ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে যোহরের আগে অথবা পরে অথবা অন্য কোনো সময়ে তা আদায় করে নেয়; তবে তার বিধান কি হবে?

-মুহাম্মাদ আল ইমরান
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : অলসতা বসত ওয়াক্তে ছালাত আদায় না করে ক্বাযা করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব সেই ছালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজদের ছালাতে অমনোযোগী' (আল-মাউন, ১০৭/৪-৫)। হাদীছে ফজরের ছালাত সময়মতো আদায় না করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় মুনাফিক্বের জন্য সবচেয়ে ভারী ছালাত হলো, এশা এবং ফজরের ছালাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫২)। সুতরাং এমন ব্যক্তি কাবীরা গুনাহগার। তাকে তওবা করে ছালাতে মনযোগী হতে হবে এবং এমন অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫) : পরে পড়ব ভেবে বিতর ছালাত রেখে দেওয়ার পর আদায়ের আগে মাসিক আরম্ভ হলে করণীয় কী? মাসিক শেষে কি ক্বাযা আদায় করতে হবে। ক্বাযা করতে হলে পদ্ধতি কী?

-আব্দুন নূর
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর: রক্তস্রাব তথা মাসিকের রক্ত দেখা গেলে ছালাত পড়া নিষেধ। মাসিকের পূর্বের কোনো ছালাত যদি ক্বাযা থেকে থাকে, তাহলে তা মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর আদায় করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাতের ক্বাযা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই হায়েযের শেষে পবিত্র হয়ে বিতর ছালাত আদায় করা উত্তম। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতরের ছালাত আদায় করে নাই, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয় (আবূ দাউদ, হা/১৪৩১; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৪৫৯৩)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) কোনো ব্যথা-বেদনা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত ছালাত পড়ে নিতেন' (ইবনু হিব্বান, হা/৭৩১৪; শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী, হা/৯৮৭)। অত্র হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, সুন্নাত ছালাতেরও ক্বাযা আদায় করা যায়।

মসজিদ

প্রশ্ন (১৬) : মসজিদে মোবাইল কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: আনুগত্যমূলক কাজের ক্ষেত্রে মসজিদেও মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে। যেমন: কুরআন ও যিকির-আযকার পড়ার জন্য। তবে যদি কোনো নাফরমানীমূলক ক্ষেত্রে হয় তাহলে অবশ্যই মোবাইল চালানো হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মসজিদসমূহ শুধু আল্লাহর যিকির, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই সিমাবদ্ধ' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৭)।

প্রশ্ন (১৭) : মেহরাববিশিষ্ট মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-মোস্তফা কামাল

উত্তর: মেহরাববিশিষ্ট মসজিদে ছালাত আদায় করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা ছালাত হবে না মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও মসজিদে মেহরাব করা যাবে কিনা এ নিয়ে বিদ্বানগণের মাঝে মতোভেদ রয়েছে (লাজনা দায়েমা, ৬/২৫২-৫৩ পৃ. মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, প্রশ্ন নং, ৩২৬)।

বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (১৮) : মোহরানার টাকা বিবাহের সময় কার কাছে দিতে হবে এবং কখন দিতে হবে?

-সাজু
রংপুর।

উত্তর: মোহরানার অর্থের হকদার স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীকে দিতে হবে। মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে মোহরানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে

তৃপ্তিসহকারে খাও' (আন-নিসা, ৪/৪)। উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছো' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৮)। স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো সে টাকা থেকে স্বামীকে কিছু ছাড় দিতে পারে, দান-ছাদাক্বা করতে পারে, সংসারের কাজে খরচ করতে পারে (প্রাগুক্ত আয়াত)। উল্লেখ্য যে, বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী যখন একাকীত্বে যাবে তখন স্বামী তার স্ত্রীকে মোহরানার টাকা বুঝিয়ে দিবে। সমাজে প্রচলিত বিবাহের সময় যে মোহরানা দেওয়া হয় সেটিও করা যায়।

প্রশ্ন (১৯) : যে পুরুষের স্ত্রী নেই সে হল, মিসকিন আর যে নারীর স্বামী নেই সে হল, মিসকিনা এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহমান
ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া।

উত্তর: এ কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। কেননা হাদীছ শাস্ত্রে এমন কোনো হাদীছের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এটি লোক মুখে প্রচলিত একটি কথা মাত্র (আহাদীছুল ক্বছাছ, 'ইবনু তাইমিয়্যা' ৩১-৩০ পৃ.)।

প্রশ্ন (২০) : এক ব্যক্তি বড় বোনকে বিবাহ করার এক বছর পর স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করে। তাহলে বড় বোন কি অটোমেটিক তালাক হয়ে যাবে, না-কি ছোট বোন তালাক হবে?

-ফয়সাল আহমেদ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: এমন দুইজন নারীকে এক সাথে একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারবে না; যাদের একজনকে পুরুষ অপরজনকে নারী ধরে তাদের মাঝে বিবাহ বৈধ হয় না। যেমন: ২জন আপন বোনকে এক সাথে বিবাহ করা। কেননা তাদের একজনকে পুরষ ধরে নেওয়া হলে, তারা ভাই-বোন হয়ে যায়। সুতরাং আপন দুইবোনকে একসাথে একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারবে না। এটি হারাম। মহান আল্লাহ একত্রে দুই বোনকে (বৈবাহিক সম্পর্ক রাখাকে একজন পুরুষের জন্য হারাম করেছেন (আন-নিসা, ৪/২৩)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে অথবা কোন মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে এবং ছোট বোনের সাথে বড় বোনকে এবং বড় বোনের সাথে ছোট বোনকে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হা/১১২৬; আবূ দাউদ, হা/২০৬৫; নাসায়ী, হা/৩২৯৮)। অতএব বড় বোন বিবাহ বন্ধনে থাকাকালীন সময়ে যে ছোট বোনকে বিবাহ করা হয়েছে তা বিবাহ হয়নি। বরং বড় বোন এখনো বিবাহ বন্ধনে রয়েছে। দ্রুত ছোট বোনের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। আর যা হয়েছে তাতে ছোট বোনের সাথে যেনার সম্পর্ক হয়েছে।

প্রশ্ন (২১) : মেয়ের বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিন্তু মেয়ের বাবা ছেলের অভিভাবক ছাড়া বিবাহ দিতে রাজি হচ্ছে না। আবার ছেলের অভিভাবকও ছেলেকে এই সময়ে বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, তাদের অজুহাত হলো, ছেলের ইনকাম কম, বিবাহের বয়স হয়নি, পড়াশুনা শেষ করে তারপর বিবাহ করাবে ইত্যাদি। যদিও ছেলে বিবাহের উপযুক্ত (বয়স ২৩+) এবং আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও সামর্থ্যবান, ভাল ইনকামের চেষ্টা করছে। আমরা জানি, মেয়ের অভিভাবক ছাড়া বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না। এরকম অবস্থায় ঐ ছেলের করণীয় কি হতে পারে?। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে কিভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে?

-মো. রেজাউল ইসলাম রানা
কাশিমপুর,গাজীপুর।

উত্তর: ছেলের বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি থাকা ভালো তবে জরুরি নয়। ছেলে সাবালক হলে অভিভাবক ছাড়াও বিবাহ করতে পারে। তবে মেয়ের জন্য অভিভাবক আবশ্যক। অভিভাবক ছাড়া মেয়ে বিবাহ করলে তার বিবাহ বাতিল হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল (তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। সুতরাং মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি নিয়েই বিবাহ করতে হবে। সম্মতি না হলে অন্য কোনো দ্বীনদার মেয়েকে খুঁজতে হবে।

প্রশ্ন (২২) : নতুন বউ দেখতে এসে টাকা দেওয়ার বিধান কি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেওয়া বিধেয়। যাতে পছন্দ-অপছন্দ করার মতো সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্যই তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়, যদিও ঐ রমণী তা জানতে না পারে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৫০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৭)। অত্র হাদীছে বিবাহের পূর্বে পাত্রি দেখার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাকে দেখতে এসে টাকা দেওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এভাবে টাকা দেওয়া

ঠিক নয়। না দিলে আবার অনেকে সমালোচনা করে থাকে এটিও ঠিক নয়। এটা একটি সামাজিক কুসংস্কার। যা বিধর্মীদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। সুতরাং এমন আমল পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৩) : জনৈক ব্যক্তির বিবাহের সময় না বুঝার কারণে সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি মোহরানা ধার্য করে। আজও তিনি ওই মোহরানা পরিশোধ করতে পারেননি। এখন স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে উক্ত মোহরানার পরিমাণ কম করা যাবে কি? যাতে স্বামী তা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: বিবাহের ক্ষেত্রে অল্প মোহরানা ধার্য করাই উত্তম (মুসতাদরাকে হাকেম, হা/২৭৪২; সুনানুল কুবরা, হা/১৪৩৩২)। তবে কেউ যদি না বুঝার কারণে বিবাহতে বেশি মোহরানা ধার্য করে ফেলে এবং তা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়। এমন ক্ষেত্রে তার স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে তার মহর কমাতে রাযি হয় তাহলে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ বলেন, '...তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের ছাড়া অন্যান্য সকল নারীদেরকে মোহরের অর্থের বদলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছো, তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। তোমাদের প্রতি কোনো গুনাহ নেই মোহর ধার্যের পরও তোমরা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণে হেরফের করলে, নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ও পরম কুশলী' (আন-নিসা, ৪/২৪)।

প্রশ্ন (২৪) : এমন কিছু কথা আছে যেগুলো বিবাহের আগে বললে নাকি বিবাহের পর স্ত্রী এমনিতেই তালাক হয়ে যায়। অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি যতবার বিবাহ করব প্রত্যেকবার আমার বউ তালাক। এক্ষেত্রে কি বিবাহ করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

-সুমাইয়া খাতুন
কাজিপুর গান্ধাইল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: এভাবে শর্ত করে বিবাহ করা জায়েয নয়। আর বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার বিধান ইসলামী শরীআতে নেই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বিয়ের আগে তালাক নেই' (ইবনু মাজাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৩২৮১; ইরওয়া হা/২০৬৮, সনদ ছহীহ)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'যে বস্তু স্বীয় মালিকানায় নেই সেই বস্তুতে আদম সন্তানের মানত হয় না। যে (দাস) স্বীয় মালিকানায় নেই তাকে আযাদ করা যায় না। যে (স্ত্রীলোক) স্বীয় অধিকারে নেই তাকে তালাক দেওয়া যায় না' (তিরমিযী হা/১১৮১; মিশকাত হা/৩২৮২; ছহীহাহ হা/২১৮৪)। এ ব্যাপারে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে তালাক বর্তায় না' (ছহীহ বুখারী ১৭/৪২৭; মুগনী ৯/৫২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/১৯১)। সুতরাং বিবাহের পূর্বে যতবার বলুক আর যেভাবেই বলুক পূর্বের তালাকের কারণে বিবাহের পর স্ত্রী তালাক হবে না।

উল্লেখ্য যে, মুয়াত্ত্বা মালেকে বর্ণিত ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি 'বিবাহের পূর্বে কারো নাম বা গোত্রের নাম উল্লেখ করে কেউ যদি বলে অমুক তালাক তাহলে বিবাহের পর তালাক হয়ে যাবে' মর্মের বর্ণনাটি মুনকাতে' (যঈফ) হওয়ায় আমলযোগ্য নয় (মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১২১৫, ১২৭৫; জামেউল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল, তাহকীক আব্দুল কাদের আরনাউত হা/৫৭৭০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৫) : কোম্পানিতে প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের যে টাকা দেওয়া হয়। তা মূলত বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে কেটে নেওয়া টাকাসহ তার সমপরিমাণ টাকা অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া হয়। এ টাকা নেওয়া যাবে কি?

-মো. আহমেদ
কালিয়াকৈর, গাজিপুর।

উত্তর: চাকুরীর ক্ষেত্র যেমন: কোনো ফ্যাক্টরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো কোম্পানি ইত্যাদি যদি সূদমুক্ত লেনদেন করে থাকে এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে কর্মচারীদের সম্মতিতে মাসিক বেতনের একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্ট কেটে রেখে দেয় এবং চাকুরী সমাপ্তির সময় তার সাথে ঐ কোম্পানি নিজের পক্ষ থেকে সে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয় তা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এই অর্থকে যদি চক্রবৃদ্ধিহারে সূদে কাজে লাগিয়ে অবসর গ্রহণকালে কর্মচারীকে বিশাল অঙ্কের টাকা প্রদান করা হয়, তাহলে মূল টাকা ব্যতীত অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তা স্পষ্ট সূদ। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। তাই এই সূদ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

প্রশ্ন (২৬) : অনলাইনে খ্রিস্টধর্মের বই লিখে আয় করা কি হালাল হবে?

-মো. আব্দুর রঊফ মন্ডল
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর: না, হালাল হবে না। কেননা ইসলামের আগমনের পর বাকি সকল ধর্ম রহিত এবং বাতিল হয়ে গেছে। আর তারা তাদের ধর্মকে বিকৃত করেছে এবং তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ বলেন, ইয়াহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র, আর খ্রিষ্টানরা বলে, মাসিহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। এসবই তাদের মুখের বানানো কথা...(আত-তওবা, ৯/৩০)। আর ইসলাম আসার পর পূর্বের সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে।

সুতরাং বর্তমান ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করা যাবে না। শুধু ইসলামের দিকেই জাতিকে ডাকতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাওরাতের একটি নুসখা/কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি নুসখা। তখন (একথা শুনে) তিনি চুপ করে থাকলেন। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তা পাঠ করতে শুরু করলেন এবং এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন (তা দেখে) আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সন্তানহারা শোক তোমাকে আচ্ছন্ন করুক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার দিকে তাকাওনি? তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আল্লাহর গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে ও মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম! আজ যদি মূসাও প্রকাশিত হতেন আর তোমরা তাকে অনুসরণ করতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে, তবে অবশ্যই তোমরা সরল-সোজা পথ হতে বিচ্যুত হতে। আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তী সময় পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৬৪৬১)। অত্র আয়াত ও হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামের আগমণের পর অন্য সকল ধর্ম বাতিল। সর্বপরি অন্য ধর্মের প্রচার-প্রসার অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল যা স্পষ্ট হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরস্পর কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও সিমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (২৭) : আমি এক ঠিকাদার থেকে কাজ চুক্তিতে নিয়েছি। আমাদের চুক্তি পত্র করা আছে। কিন্তু আমার লাভ বেশি হলে তিনি দেন না। এই রকম অবস্থায় আমি কি যেকোনো উপায়ে খরচ বেশি দেখিয়ে নিতে পারব? এটা কি আমার জন্য হালাল হবে?

-মো. আল-আমিন
ভবানীপুর, গাজিপুর সদর, গাজিপুর।

উত্তর: চুক্তিপত্র অনুযায়ী যে শর্ত করা হয়েছে তা অবশ্যই পুরণ করতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমরা নিজেদের (চুক্তিপত্রের) শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৯৪; বায়হাক্বী ছুগরা, হা/২১০৬)। সুতরাং লাভ বেশি হলে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ প্রদান না করা চুক্তি ভঙ্গের শামিল। এক্ষেত্রে ঠিকাদার দায়ি হবে এবং কাবীরা গুনাহের ভাগিদার হবে। এমন চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার এমন পরিস্থিতিতে গোপন উপায়ে খরচ বেশি দেখিয়ে টাকা বেশি নেওয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না। কেননা এমন কর্ম মিথ্যা ও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত যা স্পষ্ট হারাম। ইবনু উমার এবং আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ...'আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। আর ধোঁকাবাজ ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৬৮৪; আল-মু'জামুল কাবীর, হা/১০২৩৪)।

প্রশ্ন (২৮) : আমি পুজায় যাই না; তবে প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের পুজা উপলক্ষে তৈরিকৃত নাড়ু বা মিষ্টান্ন বাসায় দিয়ে যায়। এসব খাদ্যবস্তু কি হালাল?

-আরমান আবীর
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: হিন্দুদের পুজা উপলক্ষ্যে যে সকল খাবার তৈরি করা হয় তা খাওয়া যাবে না। কেননা এর মাধ্যমে শিরকের কাজে সহযোগিতা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে হিন্দুদের অন্যান্য হাদিয়া গ্রহণ করা যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছা.-কে ছাগলের গোস্ত হাদিয়া দেওয়া হয়ে ছিল যার মধ্যে বিষ মেশানো ছিল। বিশিষ্ট ছাহাবী আবূ হুমায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়লার শাসক রাসূল ছা.-কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দিলেন আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়-২৭)। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন মুশরিকা নারীর চামড়ার তৈরি পাত্রে পানি নিয়ে ওযূ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৫)।

প্রশ্ন (২৯) : কবরস্থানে জন্মানো গাছ থেকে কিছু খাওয়া যাবে কি? কবরস্থানে বসবাস করে এমন প্রাণী খাওয়া যাবে কি? যেহেতু এসব খাদ্যের মূল উৎস মৃত মানুষ।

-মুহাম্মদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: কবরস্থানে জন্মানো গাছের ফল, শাক-সবজি খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই; যদি তা হালাল হয়। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদিনায় গিয়ে যখন মসজিদে নববী তৈরি

করেন তখন সেখানে মুশরিকদের কবর, খেজুর গাছ ও ধ্বংসস্তূপ ছিল। অতপর কবরগুলো খনন করে স্থানান্তরিত করা হয়, খেজুর গাছগুলোকে কেটে মসজিদের কেবলা বানানো হয় এবং ধ্বংসস্তূপগুলোকে সমান করা হয় (নাসাঈ, হা/৭১০)। উক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, মৃতের হাড়-হাড্ডি অপবিত্র হলেও কবরের মাটি পবিত্র। তাই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে মসজিদ স্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে কবরের মাটিতে উৎপাদিত গাছ, ষাক-সবজি হতে ফল খাওয়া এবং হালাল প্রাণী বসবাস করলে তার গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ হবে। তবে তাতে কোনো ধরনের কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা ও বরকতের আশা করা যাবে না। তবে, সরকারী কবরস্থান হলে, ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতে পারবে না।

প্রশ্ন (৩০) : জনৈক ব্যক্তির পিতার সূদী ব্যাংকে ৩৯ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে। পিতার মৃত্যুর পর তার সন্তান এই টাকার মালিক হবে। পিতার মৃত্যুর পর এই টাকা সন্তানের জন্য শরীআতের দৃষ্টিতে ভোগ করা জায়েয হবে কি?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: জী, তার পিতার অর্জিত যে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় রয়েছে; সে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিছ সূত্রে গ্রহণ করতে পারে। কারণ তা তার প্রাপ্য অধিকার। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং কেউ মৃত্যুবরণ করার সময় পরিশোধ করার মতো কোন সম্পদ যদি সে না রেখে যায় তাহলে, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যদি সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে, সে সম্পদ তার ওয়ারিছদের জন্য (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৫০)। তবে তার পিতার সঞ্চয়কৃত টাকার উপর যে পরিমাণ সূদ হিসেবে বর্ধিত হয়েছে তা গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা তা স্পষ্ট হারাম। তাই সঞ্চয়িত টাকার অতিরিক্ত টাকা ছওয়াবের নিয়্যত ছাড়া ফক্বীর-মিসকীনকে দিয়ে দিবে অথবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিবে (মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায, ১৯/২৬৮ পৃ.)।

কুরআন সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রশ্ন (৩১) : কুরআনুল কারীমে কি মানসূখ বা রহিত হওয়া আয়াত আছে? রহিত বা মানসূখ হওয়া আয়াত থাকলে সেগুলো বাদ দিয়ে কেন কুরআনুল কারীম সংকলন করা হয়নি? আর এই আয়াতগুলো কোন সূরার কত নং আয়াত?

-আব্দুল্লাহ হাসিব
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর: মানসূখ অর্থ হলো- পরবর্তী হুকুম দ্বারা পূর্বের কোনো হুকুমকে তুলে নেওয়া। যে হুকুম তুলে নেওয়া হয়েছে, তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতকে কুরআনে বলবৎ রেখে দেওয়ার হিকমত হচ্ছে, প্রথমত, কুরআনের উদ্দেশ্য যেমন তার হুকুম-আহকাম জেনে তার প্রতি আমল করা, তদ্রূপ তা তেলাওয়াত করার মাধ্যমে নেকী অর্জন করাও কুরআনের একটি উদ্দেশ্য। তাই মানসূখ আয়াতগুলো রেখে দেওয়ার মাধ্যমে তেলাওয়াতের ফযীলত পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানসূখের মাধ্যমে সাধারণত পূর্বের কঠিন হুকুমকে হালকা করা হয়। এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি আল্লাহর যে করুণা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, মানুষ যেন তা স্মরণ করে সে কারণে আয়াতগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে (দেখুন, আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ২/৩৯)। আবার কখনো হালকা থেকে কঠিন বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমনটা মদপানের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এক্ষেত্রে রহিত আয়াতগুলো রেখে দেওয়ার হিকমত হলো, কোনো কঠিন বিধান দেওয়ার সময় ক্ষেত্রবিশেষে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে হয়, এ কথা মানুষকে শিখিয়ে দেওয়া। রহিত আয়াতগুলোর কয়েকটি উল্লেখ্য করা হল- ১. সূরা আল-বাক্বারা, ১০৯, ২. সূরা আন-নিসা, ৪৩ ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩২) : আল-কুরআনে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত বলতে কি বুঝায়?

-মুহাম্মদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো দুই ধরনের। ১. محكم স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত, ২. متشابه অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত (যার অর্থ মানুষ বোঝে না)। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি সে সত্তা যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। (এ কিতাবে দু ধরনের আয়াত রয়েছে), এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলো কিতাবের মৌলিক অংশ, বাকি আয়াতগুলো হলো অস্পষ্ট... (আলে ইমরান, ৩/১)। যে আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অর্থ স্পষ্ট তাকে আয়াতে মুহকাম বলে। আর যে আয়াতের জ্ঞান কারো জানার উপায় থাকে না তাকে আয়াতে মুতাশাবেহ বলা হয়। যেমন: কিয়ামত কবে হবে, ইয়াযুয-মাযুয ও দাজ্জাল কবে আত্মপ্রকাশ করবে, ঈসা আলাইহিস সালাম কবে দুনিয়ায় অবতরণ করবে, হরফে মুকাত্বআতের অর্থ ইত্যাদী বিষয়গুলো অস্পষ্ট (তাফসীরে কুরতুবী, আলে ইমরান, ৩/৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

হাদীছ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রশ্ন (৩৩) : আবূ দাঊদে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কুরআনকে মধুর সূরে পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মুহাম্মদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছের ইবারত হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ».

অর্থ আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে কুরআন সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে না' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৯)। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী এবং খাত্বাবী (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, এর দুটি ব্যাখ্যা আছে, ১. সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করা, ২. অন্যকে তেলাওয়াত শুনানো (শরহুন নববী, ৬/৭৯ পৃ.; আওনুল মা'বূদ, ৪/২৪১ পৃ.)। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী তার মিরকাত নামক গ্রন্থে 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়' -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে আমাদের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী নয় (মিরকাতুল মাফাতীহ, হা/২১৯৪, ৪/১৪৯৮)। সুতরাং এই হাদীছের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হলো, সে ব্যক্তি আমাদের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী নয় যে কুরআন সুন্দর কণ্ঠে ও অন্যকে শুনিয়ে তেলাওয়াত করে না।

প্রশ্ন (৩৪) : ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) নাকি ১০ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করেছেন এটা কতটুকু সঠিক?

-বাক্বী বিল্লাহ
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

উত্তর: আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। ফিক্বহের ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্য অনেক বেশি ছিল। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, النَّاسُ عِيالٌ فِي الْفِقهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ 'ফিক্বহের ক্ষেত্রে মানুষ আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী' (তাযকেরাতুল হুফফায, ১/১৬৮)। কিন্তু তিনি হাদীছের চেয়ে রায় তথা যুক্তি দিয়ে সমাধান বেশি সমাধান করতেন। যার কারণে তার অনেক মাসআলা ছহীহ হাদীছের উল্টো হয়ে যায়। তবে তিনি ১০ লক্ষ হাদীছের হাফেয ছিলেন এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর হাদীছের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ইমাম ইবনুল মুবারক হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁকে মিসকীন বলে অভিহিত করেছেন (ইবনু আবী হাতেম, আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ৮/৪৫০)।

সালামের বিধিবিধান

প্রশ্ন (৩৫) : কিছু লোক রয়েছে যাদের সালাম দেওয়া হলে তারা সালাম নিয়ে আবার সালাম দেয়। এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আর এই অবস্থায় আমার করণীয় কি? আমি কি তার সালামের জবাব দেব নাকি চুপ থাকব?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: সালাম দেওয়ার মাঝে সমাজে প্রচলিত অনেক ভুল লক্ষ করা যায়। যেমন: মুসাফাহার পর বুকে হাত দেওয়া, দুই হাতে মুসাফাহা করা, কোনো কিছু বলার পর সালাম দেওয়া ইত্যাদি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, কেউ আগে সালাম দেওয়ার পর তার সালামের জবাব দেওয়ার পর তাকে পুনরায় সালাম দেওয়া। যেখানে কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেয়াই জরুরী। উত্তর দিয়ে পুনরার সালাম দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। এভাবে পুনরায় কেউ সালাম দিলে পুনরায় তার উত্তর দিতে হবে না। এমন আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে এমন কিছুর নবউদ্ভাবন করল, যে ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)। বরং সর্বদা আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আগে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিকে উত্তম বলেছেন। আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়' (আবূ দাঊদ, হা/৫১৯৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩৮২)। আর যে সালাম দিবে না তাকে রাসূল ছা. সবচেয়ে বড় কৃপণ বলেছেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৬৬৩; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/৬৬৪৯)।

প্রশ্ন (৩৬) : একটি লোক সে আগে অমুসলিম ছিল, বর্তমানে সে পাগল। কিন্তু তাকে সালাম দিলে সে উত্তর দেয়। তাহলে কি তাকে সালাম দেওয়া যাবে?

-শেখ বায়েজিদ হোসেন
মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

উত্তর: যেহেতু লোকটি সুস্থ অবস্থায় অমুসলিম ছিল সেহেতু সে বিধানগতভাবে অমুসলিম। আর অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে না। আর পাগলকেও সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে সে কী উত্তর দিবে তা জানা ও বুঝা অসম্ভব। আর এমন ব্যক্তি থেকে শরীআতের হুকুম-আহকাম তুলে নেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে- 'ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৬৯৪; ছহীহ উবনু খুযায়মা, হা/১০০৩)।

প্রশ্ন (৩৭) : হিন্দুদের আস-সালামু আলাইকুম বলে সালাম দেওয়া বা আদাব বলা যাবে কি? তারা যদি আস-সালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয় এক্ষেত্রে সালামের জবাব কি হবে?

-আরমান আবীর
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: হিন্দু বা কোনো অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে না। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইয়াহুদি ও নাসাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না। তাদের সাথে পথে দেখা হলে সংকীর্ণতার প্রতি বাধ্য কর। (মুসলিম, হা/২১৬৭; মিশকাত হা/৪৬৩৫)। তবে, তারা যদি সালাম দেয় তাহলে, শুধু

“ওয়ালাইকুম” বলে উত্তর দিতে হবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা বল “ওয়ালাইকুম” (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৩)।

ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রশ্ন (৩৮) : ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহিতা যদি ঋণদাতার কাছে মাফ চায়, তাহলে তাকে মাফ করা যাবে কি?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর: সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে মাফ করা বা না করা আপনার ইচ্ছাধীন। তবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে পাওনা আদায় করে নেওয়া আপনার অধিকার রয়েছে। ঋণ পরিশোধ করা ঋণ গ্রহীতার উপর একটি জরুরী বিষয়। ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা- আজ দিব না, কাল দিব, মাফ করে দেন ইত্যাদি কথা বলা বা এ ধরনের আচরণ করা যুলুমের শামিল। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঋণ পরিশোধে ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম’... (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৪)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে (ঋণ ইত্যাদি) যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। সুতরাং ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উচিত হবে তাকে ঋণ দিয়ে ঋণদাতা যে অনুগ্রহ করেছে তার বদলে ঋনদাতার সাথে ভালো আচরণ করা। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে ঋণদাতার কাছে আরো সময় চেয়ে নেওয়া এবং তা পরিশোধের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমশি করা এক প্রকার যুলুম। তাই যতদ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে ঋণের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলা। অন্যথায় পরকালে ঋণের ঘানি টানতে গিয়ে নিজের সৎ আমলের ছওয়াব ঋণদাতাকে দিয়ে নিশ্চিত দেওলিয়া হতে হবে।

মৃতের বিধান

প্রশ্ন (৩৯) : নারীর লাশের গোসলের সময় নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত ঢাকলে হবে না পুরো শরীর ঢাকতে হবে?

-জাকির
হোসেন নগর, রংপুর।

উত্তর: মাইয়েত নারী হোক কিংবা পুরুষ তাকে গোসল দেওয়ার সময় পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা খোলা জায়গায় গোসল করানো দৃষ্টিকটু এবং অপ্রীতিকর। এবং গোসল করানোর সময় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া ভালো যাতে গোসলদানকারীর নিকট তা দৃষ্টিকটু না হয়। অতঃপর পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুদেরকে গোসল করাতে পারবে (ফিক্বহুস-সুন্নাহ, ১/২৬৮)। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাতে পারে (বায়হাক্বী, ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী, হা/১৮৩৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৪৬৫)।

প্রশ্ন (৪০) : জরুরি কারণে অথবা লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় লাশকে দাফনের সময় সরাসরি হাত দ্বারা মাটি দেওয়ার পরিবর্তে ডালিতে বা কোনো পাত্রে কিছু লোক মাটি দিয়ে সেই মাটি কবরে রাখলে পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? বা এটা করা যাবে কি?

-তাসলিম শেখ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যেকোনো অজুহাতে ডালিতে মাটি নিয়ে মাটি দেওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে মাটি দেওয়ার যে ছওয়াব রয়েছে তা সে পাবে না। কেউ দিলে তা বিদআত হবে। কারণ এমন কোনো প্রমাণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুধু জানাযা পড়ে ফিরে আসলে এক ক্বিরাত নেকী পাওয়া যায়। আর দাফন সম্পন্ন করে ফিরলে দুই ক্বিরাত নেকী পাওয়া যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭; মিশকাত, হা/১৬১৫)। আর এ নেকী পাওয়ার জন্য স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে মাটি দিতে হবে। একান্ত কোনো কারণে দাফন কাজে অংশ নিতে না পারলে জানাযা পড়ে ফিরে আসবে।

চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৪১) : ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কি চাকুরী করা যাবে?

-জিল্লুর রহমান
গাজীপুর, ঢাকা।

উত্তর: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (সংক্ষেপে বিএটিবি) হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম একটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি। এর ব্যবসা হলো তামাক পণ্য বিক্রি করা। তামাক নেশাদার হারাম বস্তু। যা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। এমনকি হারাম সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার সাহায্য করাও জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, ‘পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না’ (আল মায়েদা, ৫/২)। তাই এই কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকুরী করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪২) : আমার একটি ছাগলের খামার আছে। ছাগলের খাবারের জন্য ফসল উঠার সময়ে গম ও ভুট্টা কিনে রাখতে

হয়। খামারের জন্য বছরে লাগে ২০ মণ। আমি যদি ১০০ মণ কিনে রাখি। বাকি ৮০ মণ দাম বাড়লে বিক্রি করব। এতে কি পাপ হবে?

-মাহিদুল ইসলাম
বিসমিল্লাহ গোট ফার্ম, যশোর।

উত্তর: বাজারে কৃত্রিম সংকট তথা সিন্ডিকেট তৈরির উদ্দেশ্য না হলে এবং বাজারে চাহিদা পরিমাণ পণ্য মজুদ থাকলে সাময়িকভাবে পণ্য কিনে রাখার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। বরং এর ফলে খাদ্য সংকটের সময় মানুষ সহজে পণ্য হাতে পেয়ে থাকে। সুতরাং এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। (আল-মুগনী, 'ইবনু কুদামা', ৬/৩১৭)। আর সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করা যায়। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযীর থেকে প্রাপ্ত খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫৭)। তবে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে পণ্য গুদামজাত করা হারাম এবং অভিশাপের কাজ। সুতরাং এমন উদ্দেশ্যে খাদ্য গুদামজাত করা যাবে না। মা'মার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গুনাহগার ছাড়া কেউ পণ্য গুদামজাত করে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)।

যিকির-আযকার

প্রশ্ন (৪৩) : যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে, তার যাবতীয় বিপদ-আপদ দূর করা হবে' যার সর্বনিম্ন হলো দরিদ্র্যতা মোচন করা' (তিরমিযী, ৩/১৮৬)। এই হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহমান
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর: পূর্ণ হাদীছটি হচ্ছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ দুআটি বেশি করে পাঠ করবে, কেননা এটি হল জান্নাতের সঞ্চয়-ভান্ডার হতে একটি সঞ্চয় ভান্ডার। হাদীছটির এই অংশটুকু ছহীহ। তবে পরের অংশটুকু ছহীহ নয়। তা হচ্ছে, মাকহুল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে, তার যাবতীয় বিপদ-আপদ দূর করা হবে' যার সর্বনিম্ন হলো দরিদ্র্যতা মোচন করা'। হাদীছ বিশারদগণ বলেছেন, মাকহুলের এই কথাটুকু অবিচ্ছন্ন সূত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কেননা মাকহুল একথা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেনি (তিরমিযী, হা/৩৬০১)।

প্রশ্ন (৪৪) : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় গর্ভবতীদের করণীয় কী?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদেরসহ সকলের যেসব জিনিস পালন করা উচিত হবে, তা হলো- (১) বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা (২) দুআ করা (৩) তাকবীর পাঠ করা (৪) ইস্তেগফার পড়া (৫) ছাদাকা করা (৬) দাস মুক্ত করা (৭) ছালাত আদায় করা (ছহীহ বুখারী, হা/১০৫৯, ১০৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯০১)। উল্লেখ্য যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকে কেন্দ্র করে সমাজে গর্ভবতীর জন্য বিভিন্ন বাধা-নিষেধ, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় তুলে ধরা হয় যার কোনো ভিত্তি নেই। বরং সবার মতো তারাও স্বাভাবিক থাকবে এবং উল্লেখিত আমলগুলো করবে।

শিক্ষা-সংস্কৃতি

প্রশ্ন (৪৫) : বাংলাদেশের সকল পাবলিক ভার্সিটিতে সহশিক্ষা চালু আছে। আর এখানে পর্দা পালন করতে বাধা দেওয়া হয়। আরও অনেক সমস্যা আছে। তাই সঊদী আরবের ভার্সিটিতে মাহরাম ছাড়া পড়া যাবে কি?

-রুকাইয়া শান্তা

উত্তর: নারীদের জন্য মাহরাম ব্যতীত একদিন-একরাতের বেশি দূরত্বে সফর করা হারাম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য একদিন-একরাতের দূরত্বে মাহরাম ব্যতীত সফর করা হালাল নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৯; ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৮)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহিলারা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না এবং পুরুষরাও যেন কোনো মহিলার কাছে মাহরাম ব্যতিরেকে প্রবেশ না করে (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৬৩)। তাই অবাধ ঘোরাফেরার সুযোগ আছে এমন পরিবেশে মেয়েদের রেখে পড়ালেখা করানো জায়েয নয়। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অবাধ চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সাথে মেয়েদের যাতায়াতের সময় মাহরাম সাথে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করানোতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে, মাহরাম ছাড়া মেয়েরা থাকতে পারে। আদি ইবনু হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, [হে আদি ইবনু হাতেম!] 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে যাবে। এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪০০; কুবরা বায়হাক্বী, হা/১০১৩১)। সুতরাং সে সকল ভার্সিটিতে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে, যাতায়াতের সময় মাহরামের ব্যবস্থা থাকলে পড়ালেখা করতে পারে (লাজনা দায়েমা, ১২/১৭৮)।

দান-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (৪৬) : আমার স্বামী সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে। আমাকে হাত খরচের যে টাকা দেয় তা থেকে দান করলে আমার কি ছওয়াব হবে অথবা অন্যান্য ইবাদত কি কবুল হবে? আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু সে এ চাকুরী ছাড়বে না। আমার করণীয় কি?

-লুৎফা আক্তার
মীরের বেতকা, টাংগাইল।

উত্তর: স্বামীর সম্পদ স্ত্রীর নিকট আমানত। সে যদি তাতে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারী তার স্বামীর বাড়ির দায়িত্বশীল তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৮৫৩)। তবে, স্ত্রী স্বামীকে না বলে পরিমাণ মত দান করতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী হতে বিপর্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত ছাদাক্বা করলে সে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাবে, উপার্জন করার কারণে স্বামীও এর ছওয়াব পাবে...(ছহীহ বুখারী, হা/১৪৩৭)। তবে, সম্পদ হারাম হলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র আর পবিত্র ছাড়া তিনি কবুল করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫০০)। এক্ষণে স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীকে বোঝানো। যদি সে না বোঝে তাহলে এর জন্য স্বামী পাপী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না' (আল-আনআম, ৬/১৬৪)।

জ্ঞান অর্জন

প্রশ্ন (৪৭) : একজন সাধারণ মুসলিমের কতটুকু ইলম/জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য আবশ্যক বা যথেষ্ট?

-মুহাম্মদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: ইসলামের উপর চলতে গেলে যে যেই বিধানের সম্মুখিন হবে তার উপর সে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। সুতরাং সাধারণ মানুষের কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন হলে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে আমল করবে। যেমন ধরুন, কেউ ছালাত আদায় করবে, তাহলে তাকে ছালাত বিষয়ে জানতে হবে, কেউ যাকাত দিবে তাকে যাকাত বিষয়ে জানতে হবে, কেউ ব্যবসা করবে তাকে ব্যবসার হালাল-হারাম সম্পর্কে জানতে হবে, কেউ বিবাহ করবে তাকে বিয়ের মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে হবে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি মুসলিমের উপর জ্ঞান অন্বেষন করা ফরজ' (ইবনু মাজাহ, হা/২২৪; মিশকাত, হা/২১৮)। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ইবাদত পালন করা শরীআ বান্দার উপর আবশ্যক করে দিয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বান্দার উপর ফরজ। যেমন: যাকাত প্রসঙ্গে জ্ঞান অর্জন করা যদি নিছাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, হজ্জ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয, হজ্জে যাওয়া সামর্থ্য হলে (শারহুস সুন্নাহ, ১/২৯০ পৃ.)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮) : বজ্রপাত সম্পর্কে ইসলামিক ব্যাখ্যা কী এবং বজ্রপাতের সময় আমাদের করণীয় কী?

-মো. রোকনুজ্জামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হলো তিনি মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ চমকান। আর এ বিদ্যুতের মাঝে আশা ও নিরাশা দুটোই বিদ্যমান। কেননা, এই বজ্রপাতের মাধ্যমে অনেক বনী আদম দুনিয়া ত্যাগ করে। আবার অনেক মানুষ বিদ্যুৎ চমকে আশার আলো দেখতে পায়, তারা মনে করে, এই তো বুঝি রহমতের ঝর্ণা ধারা বয়ে যাবে এবং সিক্ত হবে খরতাপে চৌচির হওয়া পৃথিবী। গাছ-গাছালী, তরুলতা ও ঘাস ফিরে পাবে নতুন জীবন। ফুলে-ফলে ভরে উঠবে কৃষকের জমিন। ফলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। উৎকট ও ভ্যাপসা গরম থেকে রক্ষা পাবে সকল মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি ভয় দেখানোর জন্য ও আশা সঞ্চারের জন্য মেঘের মাঝে তোমাদের বিদ্যুৎ চমক দেখান, তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। মেঘের গর্জন ও ফেরেশতারা প্রশংসাসহ তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি বজ্রপাত করান, অতঃপর যাকে চান তাকে বজ্রাঘাত করেন, অথচ তারা (কাফেররা) আল্লাহর অস্তিত্ব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি তার কৌশলে ও মাহাত্ম্যে অনেক বড়' (আর-রা'দ, ১৩/১২-১৩)। বিপদাপদে নিম্নের দু'আ পাঠ করা যায়। যথা-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম (আম্বিয়া, ২১/৮৭)।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বজ্রপাতের সময় বিশেষভাবে এই দুআটি পাঠ করতেন- سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ঝড়ো হাওয়া বইতো, তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এতে নিহিত কল্যাণ ও প্রেরিত কল্যাণ কামনা করছি। আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট, এতে নিহিত অনিষ্ট ও প্রেরিত অনিষ্ট হতে আশ্রয় গ্রহন করছি। আশেয়া রযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আর যখন তিনি আকাশে মেঘ দেখতে পেতেন, তখন তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত, আর ঘর হতে বের হতেন ও ঘরে প্রবেশ করতেন। বৃষ্টিপাত হলে, তাঁর সকল চিন্তা দূর হয়ে যেত… (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৯)।

প্রশ্ন (৪৯) : ফরয ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য কি?

-বদরুদ্দোজা
কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: জমহূর ফক্বীহদের মতে ওয়াজিব ও ফরযের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মতে এ দুটি সমার্থক শব্দ। (মুযাক্কিরাতুন ফী উছূলিল ফিক্বহ, ১/১২)। অনুরূপভাবে সুন্নাত ও নফলও একই জিনিস। তবে সুন্নাতের মাঝে কিছু সুন্নাত এমন আছে, যা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর কিছু এমন আছে, যার গুরুত্ব তুলনামূলক কম। যেমন সুন্নাত ছালাতের মধ্যে ফজরের পূর্বের দুই রাকআত, বিতরের ছালাত অন্যান্য সুন্নাত ছালাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব রাখে।

প্রশ্ন (৫০) : আদম আলাইহিস সালাম -এর বয়স কত ছিল?

-আল আমিন
নওগাঁ।

উত্তর: আদম আ.-এর বয়স ছিল ১০০০ বছর। রাসূলুল্লাহ ছা. বলেন, আদম আলাইহিস সালাম -এর নিকট মালাকুল মাউত এসে হাজির হলে তিনি তাকে বললেন, আমার ধার্যকৃত বয়স হলো এক হাজার বছর। যথাসময়ের আগেই তুমি এসেছো। মালাকুল মাউত বললেন, হ্যাঁ; তবে আপনি আপনার বয়স হতে ষাট বছর আপনার বংশধর দাউদ আলাইহিস সালাম -কে দান করেছিলেন। আদম আলাইহিস সালাম তা ভুলে গিয়ে অস্বীকার করে বসলেন (তিরমিযী, হা/৩৩৬৮; মিশকাত, হা/৪৬৬২ 'হাসান হাদীছ')।

'দরসে হাদীছ'-এর বাকী অংশ

অনুরূপভাবে একজন দ্বীনের ও কুরআনের আলেমকে আদালতে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও এগুলো স্মরণ করে স্বীকার করে নিবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী আমল করে এসেছো? সে বলবে, আমি আপনার দ্বীন ও কুরআনের জ্ঞান লাভ করেছিলাম আর তা আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি তো নিজেকে আলেম ও ক্বারী হিসেবে প্রকাশ করার জন্য ওসব করেছিলে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর আরেক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও এগুলো স্মরণ করে স্বীকার করে নিবে। তাকেও জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কী করে এসেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি পুণ্য অর্জনের এমন কোনো খাত অবশিষ্ট রাখিনি, যে খাতে ব্যয় করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছিলে যে, তোমাকে বড় দানশীল বলা হবে, আর দুনিয়াতে তো তোমার দানশীলতার সুনাম হয়েই গিয়েছে। তারপর তাকেও উপুড় করে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫)*। মোটকথা, আল্লাহর কাছে কেবল ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য হবে, যা বিশুদ্ধ নিয়্যতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে নিয়্যত। আলোচ্য হাদীছের আলোকে নিয়্যতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিয়্যতের ব্যবহার করতে হবে, যাতে কোনো কাজ বা আমল নিষ্ফল না হয়। যেকোনো আমলে আমরা নিয়্যতকে অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করব যাতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদির যথাযথ প্রতিদান পাই। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক মুবাহ কাজ করতে হয়, যেগুলো নিয়্যতসহ করলে আমাদের আমলনামায় তার পুরস্কার লিপিবদ্ধ হবে। আমরা যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়্যতকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে পারি সেই তাওফীক্ব আল্লাহ আমাদের দান করুন- আমীন!

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
  বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :

- বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
  বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :

- নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
  বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

- নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
  নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
  রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

- আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
  বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
  বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী কনফারেন্স
২০২২-২৩

২য় বার্ষিক
দিনাজপুর
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সময়: জুমু'আহর খুতবার মধ্য দিয়ে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

৭ম বার্ষিক
ঢাকা
২ ও ৩ মার্চ, ২০২৩
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আদ-দাওয়াহ
মিডিয়া পার্টনার মাসিক আল-ইতিছাম Al-Itisam TV

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

সার্বিক সহযোগিতায়
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

Monthly Al-Itisam الاعتصام 7th Year, 3rd Part, January 2023, Price : 30.00